কাচ সমুদ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কাচ সমুদ্র

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পার্ল পাবলিকেশন্স

©
লেখক

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
তৃতীয় মুদ্রণ
মার্চ ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ
অক্টোবর ১৯৯৯
পঞ্চম মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০০
ষষ্ঠ মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০২
সপ্তম মুদ্রণ
জানুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ISBN-984-495-032-9

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ সংস্থা, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস দীপ্তি কম্পিউটারস ৩৮/২খ বাংলাবাজার ঢাকা।

মূল্য : ৫৫.০০ টাকা

উৎসর্গ

মাহবুব জামান

প্রিয়জনেষু

(স্বপ্ন তো সবাই দেখতে পারে, আমিও দেখি।
কিন্তু সেটা সত্যি করতে পারে কয়জন?)

॥ এক ॥

রিয়াজ গলায় ফেঁসে থাকা শক্ত টাইয়ের গিঁটটা একটু আলগা করে মনে মনে নিজেকে একটা গালি দেয়—মোটামুটিভাবে নিরীহ এবং ভদ্রগোছের একটা গালি। ঠিক কেন সে এটা করল তার জানা নেই কিন্তু একটু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল গালি দিয়ে তার কেমন জানি একধরনের আরামবোধ হল। খুব উচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্মিক টাইপের আরাম নয়—কিন্তু আরাম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। উৎসাহ পেয়ে সে ব্যাপারটা আরো কয়েকবার চেষ্টা করে দেখল। প্রথমে 'হারামজাদা' 'বাঞ্চত' 'হারামখোর' এ ধরনের বিচ্ছিন্ন কিছু বাংলা শব্দ দিয়ে শুরু করে কিছুক্ষণেই সে কুৎসিত ইংরেজি গালিতে চলে এল। গালিগালাজের জন্যে ইংরেজি ভাষার কোনো তুলনা হয় না। দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সংক্রান্ত জটিল, অশ্লীল এবং দুরূহ বিষয়গুলি ইংরেজিতে খুব সহজেই একটি-দুটি শক্তিশালী শব্দ দিয়ে প্রকাশ করে দেওয়া যায়। কিছু কিছু চমৎকার ইংরেজি গালি আছে যার বাংলায় ভালো প্রতিশব্দ পর্যন্ত নেই। আর যদিওবা থাকে, সেই প্রতিশব্দ এমন চাঁছাছোলা রসকসহীন যে সেগুলি গালি না উপাসনার স্তবক চট করে বোঝার উপায় নেই।

রিয়াজ এদিক-সেদিক তাকিয়ে গলা থেকে টাইটা একটান দিয়ে খুলে গর্ভযন্ত্রণাটার উপশম করে দেবে কি না চিন্তা করে শেষপর্যন্ত সেটা গলায় ঝুলিয়ে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। প্রথমত সে চকচকে একটা স্যুট পরে এসেছে, কুচকুচে কালো স্যুটের সাথে মিল রেখে পরেছে কালো জুতো (আজ সকালে নিজের হাতে পালিশ করে সে জুতোজোড়া একেবারে আয়নার মতো চকচকে করে ফেলেছে) চাইনিজ ড্রাই ক্লিনার থেকে একেবারে দেশী কায়দায় মাড় দেওয়া শাদা শার্ট এবং তার সাথে মিল রেখে উজ্জ্বল লাল রঙের চওড়া এই টাই—যেটা মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে শক্ত ফাঁসের মতো তার গলায় এঁটে বসছে। তার সাজপোশাকের সাথে মিলিয়ে পরে আসা এই টাইটা হঠাৎ করে খুলে ফেললে তাকে দেখাবে দেশের মফস্বলের কলেজ-মাস্টারদের মতো, যারা সাজপোশাকের কোনো সুযোগ পায় না বলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় গার্ড দিতে আসার সময় জমকালো

একটা পোশাক পরে চলে আসে। টাইয়ের ব্যাপারটি নিয়ে অবশ্যি রিয়াজের মাথায় আরো একটা সূক্ষ্ম দুশ্চিন্তা উঁকি দিতে শুরু করেছে। টাইয়ের ফ্যাশন মনে হয় চওড়া থেকে এখন আবার সরুর দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। আজ সকালে ট্রেনে সে যতগুলি মানুষকে টাই পরে যেতে দেখেছে তাদের সবার টাই-ই ছিল তার টাই থেকে সরু। যদি সত্যিই টাইয়ের ফ্যাশন পাল্টে গিয়ে থাকে তাহলে তার এই চওড়া টাইয়ে তাকে নিশ্চয়ই এখন একটা উজবুকের মতো দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়—প্রথমদিকে টের পায়নি কিন্তু গত আধাঘণ্টা লাউঞ্জের একটা গদি-আঁটা তুলতুলে নরম চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে টের পেয়েছে সে টাইটা বেশি শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। চিন্তাটা একবার মাথায় ঢুকে যাবার পর আর সেটা মাথা থেকে দূর করা যাচ্ছে না এবং যতই সে গিঁটটা ঢিলে করুক-না কেন তবুও তার নিশ্বাস আটকে আসছে। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে এত ভেবেচিন্তে কাজ করার পরেও এরকম একটা নির্বুদ্ধিতা করার জন্যেই মনে হয় নিজেকে গালিগালাজ করে এক-ধরনের আরামবোধ হচ্ছে। মনে মনে গালিগালাজ না করে সে যদি জোরে জোরে করতে পারত—অন্তত পক্ষে চাপা স্বরেও করতে পারত তাহলে নিশ্চয়ই আরো অনেক আরাম হত। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখার উপায় নেই। সে চাকরিতে ইন্টারভিউ দেবার জন্যে নিচে লাউঞ্জে বসে আছে, যে-কোনো মুহূর্তে ওপর থেকে কেউ একজন এসে তাকে ডেকে নেয়ার জন্যে হাজির হতে পারে। এখন রং-তামাশার বিশেষ সুযোগ নেই।

রিয়াজ ঘড়ির দিকে তাকাল, তাকে যে-সময় দেখা করতে বলেছে সেটা প্রায় পনের মিনিট হল পার হয়ে গেছে। লাউঞ্জের টেলিফোন থেকে আবার ওপরে একটা টেলিফোন করবে, নাকি এই জাতির সময়ানুবর্তিতার পশ্চাৎদেশ মর্দন করে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেবে সেটা নিয়ে নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করছিল ঠিক তখন দেখতে পেল চশমা-পরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন মানুষ একটা কফি-মগ হাতে নিয়ে হনহন করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষটির গায়ে একটি চেক-চেক উলের শার্ট, পরনে ভুসভুসে নীল জিন্স, পায়ে নাইকির টেনিস-স্যু। ছুটির দিনে ঘর রং করার জন্যে মানুষ এরকম কাপড় পরে, সম্ভ্রান্ত একটা কোম্পানিতে চাকরিজীবী মানুষের এরকম কাপড় পরে অফিস করার কথা না। রিয়াজ মোটামুটি নিঃসন্দেহ ছিল মানুষটি তার কাছেই আসছে, তবুও সে একেবারে তার কাছে এসে না-থামা পর্যন্ত গদি-আঁটা তুলতুলে নরম চেয়ারটাতে উদাস-উদাস মুখ করে বসে রইল।

মানুষটি তার কাছে এসে কফির মগটি হাতবদল করে তার দিকে ডানহাতটি এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই রিয়াজ—"

মানুষটির 'র' উচ্চারণ 'ড়'-এর মত এবং তার নামটি শোনাল 'ড়েয়াজ'। বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসার পর প্রথম প্রথম এই উচ্চারণে সে চমকে উঠত, আজকাল বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, কেউ যদি হঠাৎ তাকে 'রিয়াজ' বলে ডাকে মনে হয় সে চমকে উঠবে।

রিয়াজ উঠে দাঁড়িয়ে মানুষটির সাথে করমর্দন করল। মানুষটি হ্যান্ডেলে না ধরে গরম কফি-মগের পেট চেপে ধরে রেখেছিল বলে তার হাতটি জ্বরগ্রস্ত মানুষের মতো গরম। রিয়াজের হাত ধরে বেশ জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি বব কার্ডওয়েল।"

রিয়াজ দাঁত বের করে হেসে মুখে খুব একটা স্বচ্ছন্দ ভাব ফুটানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "তোমার সাথে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম, বব।"

বব রিয়াজের হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা কাত করে খুব মনোযোগ দিয়ে তার পোশাক পর্যবেক্ষণ করে বলল, "তুমি যেরকম সেজেগুজে এসেছ যে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কারো মৃতদেহ সৎকার করতে এসেছ!"

কথাটি একটি রসিকতা এবং সেটা নিয়ে যেন কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে সেটা নিশ্চিত করার জন্যে বব হা হা করে হাসতে থাকে। রিয়াজ লক্ষ করল বব কার্ডওয়েলের দাঁতে একধরনের অসুস্থ হলুদ রং, শৈশবে মনে হয় একাধিকবার কড়া ডোজের টেটরাসাইক্লিন খেয়েছে। এদেশে তো প্লেগ নেই—এই ডোজের টেটরাসাইক্লিন খেতে হল কেন? বাবার সিফিলিস ছিল নাকি?

বব এত জোরে জোরে হা হা করে হাসার পরেও রিয়াজ তার পোশাক নিয়ে এই খোঁটাটাকে পুরোপুরি রসিকতা হিসেবে নিতে পারল না। সে টের পেল তার ভিতরে অপমানের একধরনের দূষিত বাষ্প জমা হতে শুরু করেছে। বব কার্ডওয়েল সেটি লক্ষ করল বলে মনে হল না, হাসি থামিয়ে বলল, "যখন কেউ ইন্টারভিউ দিতে আসে তখন কী সুন্দর সেজেগুজে আসে কিন্তু জয়েন করার পরেই ছেঁড়া জিন্স! আর যারা তোমাদের বয়সী তাদের কথা তো ছেড়েই দাও, তারা-যে কোনোমতে তাদের মূল্যবান পাছাটাকে ঢেকে আসে সেটাই যেন আমাদের কপাল!"

রিয়াজ আড়চোখে মানুষটার দিকে তাকাল। সাধারণ মানুষের স্কেলে যদি এক থেকে দশের মাঝে নম্বর দিতে হয় তাহলে এই মানুষটির দুয়ের বেশি পাওয়ার কথা নয়। কথাবার্তার বিষয়বস্তু পোশাকের বাইরে যাচ্ছে না, যদিও তার নিজের পোশাক নিয়েও বিতর্কের প্রচুর অবকাশ আছে।

মানুষটি কফির মগে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, "কফি খাবে?"

এরকম পরিবেশে এককাপ কফি প্রায় জীবনরক্ষাকারী একটা ব্যাপার। কফির কাপটা হাত দিয়ে ধরে রেখে হাতকে ব্যস্ত রাখা যায়। মাঝে মাঝে সুচিন্তিত ভঙ্গিতে কফি-কাপে চুমুক দিয়ে চেহারায় একটা আলগা আত্মপ্রত্যায় আমদানি করে ফেলা যায়। কিন্তু মানুষটা রিয়াজের পোশাককে নিয়ে খোঁটা দিয়ে মেজাজটা একটু খিঁচে দিয়েছে, তাই তার কফির আহ্বানটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলল, " আমি বেশ আছি, অনেক ধন্যবাদ।"

মানুষটা গভীর সমস্যা থেকে বেঁচে যাবার ভঙ্গি করে বলল, "উহ! বাঁচিয়েছ। তোমাকে জিজ্ঞেস করার পরই মনে পড়ল এইমাত্র কাফেটারিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কফি খেতে চাইলেই ফেঁসে যেতাম।"

খুব একটা মজার ব্যাপার হয়েছে এরকম ভঙ্গি করে লোকটা আবার হা হা করে হাসতে শুরু করল। রিয়াজ আবিষ্কার করল, এর দাঁত শুধু হলুদ নয়, এর মুখের দুপাশে দাঁতের পাটিতে রয়েছে ডেন্টিস্টদের নানাবিধ শিল্পকর্ম। এর দাঁতে যত ধাতু রয়েছে, হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে কোনোদিন প্লেনে উঠতে পাবে বলে মনে হয় না! মেটাল ডিটেক্টর আটকে দেবে।

মানুষটা—যার নাম বব কার্ডওয়েল এবং যাকে রিয়াজ মোটামুটিভাবে অপছন্দ করে ফেলেছে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "চল উপরে যাই। তোমার সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিই।"

"চল।"

রিয়াজ বব কার্ডওয়েলের পাশাপাশি হেঁটে যেতে থাকে। বব দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে মুখে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য টেনে বলল, "আজকাল চওড়া টাইয়ের ফ্যাশন?"

রিয়াজ আবার নিজের ভিতরে অপমানের একটা সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করে। মানুষটির চোখে অবশ্যি কৌতুক বা রহস্যের কোনো চিহ্ন নেই, যেটুকু রয়েছে সেটা আগ্রহ এবং কৌতূহল, মনে হয় সত্যিই জানতে চাইছে। রিয়াজ আমতা আমতা করে যেটা বলল সেটা পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণসিদ্ধ

বাক্য নয়। তার উত্তরটা হল অনেকটা এই রকম: "না-মানে-ইয়ে-আমি-মানে মনে হয় ইয়ে মানে টাই—ঠিক জানি না।"

বব রিয়াজের উত্তর নিয়ে মাথা ঘামাল না, চোখ কুঁচকে বলল, "ছেলেদের টাইয়ের সাইজ আর মেয়েদের স্কার্টের দৈর্ঘ্যের টাইম সাইকেল প্রায় সমান। ছয় বছরের কাছাকাছি। আমি যে-বছর বিয়ে করেছি সে-বছর স্কার্টের দৈর্ঘ্য ছিল ছোট আর টাই ছিল সরু। এখন ছয় বছর হয়েছে, স্কার্ট তো লম্বাই দেখি, টাইও নিশ্চয়ই চওড়া হবে।"

রিয়াজ একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি গত ছয় বছরে টাই পরনি?"

"পরেছি মাঝেমধ্যে। কনফারেন্সে পেপার দেয়ার সময় পরতে হয়, নাহলে কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট খুব রাগ করে।" বব তার কফি-মগে চুমুক দিয়ে বলল, "অন্য একজন টাই পরলে দেখতে খুব ভালো লাগে কিন্তু যে পরে তার জন্যে যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু না। আমার পরিচিত এক গাধা টাই পরে লেদমেশিন চালাতে গিয়েছিল। সেই টাই স্পিন্ডলে আটকে গিয়ে—" বব কথা বন্ধ করে লেদমেশিনে টাই আটকে গিয়ে তার গাধা-বন্ধুটির মাথা কীভাবে গুঁড়ো হয়ে ঘিলু উড়ে যাচ্ছে সেটি এমন নিখুঁতভাবে অভিনয় করে দেখাল যে রিয়াজ মুগ্ধ হয়ে গেল। মুখ বিকৃত করে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছিল তার? বেঁচে ছিল?"

"অবশ্যি বেঁচে ছিল। গাধারা এত সহজে মরে না। সবসময় আধমরা হয়ে বেঁচে থাকে। অন্যদের নিজেদের বোকামি দেখানোর জন্যে সবসময় মুখে সাইনবোর্ড টানিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। বলা যেতে পারে এটা দুনিয়ার নিয়ম।"

আলোচনাটি হঠাৎ করে প্যাকেজড দর্শনের দিকে মোড় নেয়াতে রিয়াজ মোটামুটি উৎসাহ অনুভব করে। সে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে মরে কারা?"

বব কার্ডওয়েল হঠাৎ রিয়াজের দিকে ঘুরে তাকাল, তার প্রশ্নটি কি কথার পিছনে কথা নাকি সত্যিই সে এ ব্যাপারে বব কার্ডওয়েলের মতটি জানতে চাইছে সেটা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বের করে নেয়ার একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা করল। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারল না তাই একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মরে যাদের কপাল খারাপ তারা। আর মজা কী জানো? না-মরা পর্যন্ত তুমি জানবে না তোমার কপাল খারাপ কিনা!"

নিজের দার্শনিকতায় বব আবার হা হা করে হাসতে থাকে। সাধারণ মানুষের স্কেলে যদি এক থেকে দশের মাঝে নম্বর দিতে হয় তাহলে এই

মানুষটাকে মনে হয় দুইও দেয়া যাবে না। টেনেটুনে একও পাবে কিনা সন্দেহ।

দোতলায় উঠে নানারকম করিডর ধরে হেঁটে হেঁটে বব রিয়াজকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে হাজির হল। সেখানে একজন মানুষ তার চশমাকে কপালে আটকে রেখে একটা কম্পিউটারের মনিটরের খুব কাছে চোখ নিয়ে কিছু একটা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বব তার দরজায় শব্দ করে বলল, "জিম। এই-যে আমাদের ক্রীতদাস।"

জিম মনিটর থেকে চোখ না সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক্রীতদাস?"

"হ্যাঁ। কলাম্বিয়া থেকে সামারে কাজ করার জন্যে যে-ছেলেটার আসার কথা ছিল—"

জিম নামের মানুষটি কম্পিউটারের মনিটরে অদৃশ্য একটা-কিছুকে আঙুলে চেপে ধরে রেখে রিয়াজের দিকে ঘুরে তাকিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তুমি ববের কথায় কিছু মনে করো না। ওর হবি হচ্ছে বাজে কথা বলা।"

রিয়াজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না, না, মনে করার কী আছে?"

"তুমি আজকে থেকে কাজ শুরু করে দিতে পারবে?"

"আজকে থেকে?" রিয়াজ চমকে উঠল। তাহলে কি তার চাকরি হয়ে গেছে? ইন্টারভিউ হবে না? রিয়াজের মনে হল তার বুকের বালু-বেলায় আনন্দের একটা বড় ঢেউ যেন ছলাৎ করে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। এই তিনমাস তার হিসেব করে পয়সা খরচ করতে হবে না। চাই কি সামারের শেষে একটা গাড়ি কিনে ফেলতে পারবে। পুরনো সেকেন্ডহ্যান্ড একটা গাড়ি। শেভি সিভেট। কিংবা কপাল ভালো হলে একটা টয়োটা টার্সেল।

রিয়াজের হতচকিত ভাব দেখে জিম ধরে নিল রিয়াজ আজকে কাজ করতে পারবে না। সে আবার কম্পিউটার মনিটরের অদৃশ্য বস্তুটির দিকে ফিরে যাচ্ছিল, রিয়াজ তাকে থামাল। উত্তেজনায় 'হ্যাঁ' 'অবশ্যি' 'কিন্তু' 'মনে হয়'—এই ধরনের শব্দাংশ ব্যবহার করে আরো একটা ব্যাকরণ-অসিদ্ধ বাক্য বলতে শুরু করে মাঝখানে থেমে গিয়ে বলল, "আমার কি চাকরি হয়ে গেছে? ইন্টারভিউ হবে না?"

জিম এবং বব একজন আরেকজনের দিকে তাকাল এবং মনে হল একটু হেসেও ফেলল। তারপর দু'জনেই ঘুরে রিয়াজের দিকে তাকাল। বব তার কফি-মগটাতে আরেকটু চুমুক দিয়ে বলল, "এটাই হচ্ছে তোমার

ইন্টারভিউ। তোমার লাল টাইটা দেখে আমরা এত মুগ্ধ হয়ে গেছি যে সামারের তিন মাস অল্প কিছু ডলারের বিনিময়ে জিমের ক্রীতদাস হয়ে কিছু নোংরা এবং অসম্ভব আনন্দহীন এবং একঘেয়ে কিছু কাজ করার প্রস্তাব দিচ্ছি। তুমি যদি রাজি থাকো—"

জিম মাঝখানে ববকে থামিয়ে দিয়ে রিয়াজকে বলল, "তুমি ওর কথা শুনো না। গ্রাফিক্স ইন্টারফেসের একটা প্রোগ্রাম লেখা মোটেও আনন্দহীন একঘেয়ে কাজ নয়।"

রিয়াজ অনুভব করে আনন্দের একটা ছোট ঢেউ হঠাৎ বিশাল একটা জলোচ্ছ্বাস হয়ে তার ভিতরটা প্লাবিত করে দিচ্ছে। পয়সাকড়ির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, এরকম একটা কোম্পানিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে আরো কত বড় দাঁও মারা যাবে। ভবিষ্যতে চাকরি ইমিগ্রেশন—কোনো সমস্যাই হবে না। রিয়াজ দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমি এখনই কাজ শুরু করে দিতে পারি। আর ইন্টারভিউ যদি সত্যি না থাকে তাহলে আমি একটু হালকা হয়ে নিই।"

রিয়াজ টান দিয়ে তার টাইটা খুলে নেয়। গলায় এঁটে-থাকা শক্ত বোতামটা আলগা করে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিল। তারপর কোটটা খুলে হাতে নিয়ে দুজনের দিকে তাকাল। বব এবং জিম দুজনেই হাসিমুখে রিয়াজের দিকে তাকিয়েছিল, এই পর্যায়ে বব বলল, "আরো খুলবে, নাকি এই পর্যন্তই?"

"এই পর্যন্তই।"

"বাঁচালে। কোম্পানিতে শতকরা দশভাগ মানুষ সমকামী জানো তো?"

জিম সত্যি সত্যি এবারে বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি এত বাজে কথা বলতে পার! যাও ওকে দেখাও কোথায় বসবে কী সমাচার।"

বব জিমের বিরক্তিটুকু গায়ে মাখল না, রিয়াজকে বলল, "তুমি শুধু কাগজপত্রে জিমের সাথে কাজ করবে কিন্তু জিম কখনো তোমাকে কোনো সময় দেবে না। যতক্ষণ অফিসে থাকবে ততক্ষণ সে একটা উচ্চক্ষমতার মিটিং থেকে আরেকটা উচ্চক্ষমতার মিটিঙে বসে বসে ঝিমুবে। যখন মিটিং থাকবে না তখন মনিটরে নাক লাগিয়ে বসে থাকবে। তুমি যদি দশটা প্রশ্ন করো সে একটা উত্তর দেবে। আর সেই উত্তরটাও হবে—"

জিম সত্যি সত্যি মনিটরে নাক লাগিয়ে বলল, "যাও! বকবক করো না।"

"হ্যাঁ, সেই উত্তরটাও হবে এরকম। ছোট ছোট কিন্তু অর্থবহ। বেশিরভাগই অর্বাচীন অবুঝ শিশুদের প্রতি ভর্ৎসনা।"

রিয়াজ একটু আগেই এই মানুষটিকে অপছন্দ করেছিল কিন্তু শুধু মুখের কথায় তাকে গ্রীষ্মকালীন একটা চাকরি দিয়ে দিয়েছে জানতে পেরে হঠাৎ তাকে তার ভালো লাগতে শুরু করল! একটু আগেই যে-কথাগুলিকে ধ্যাষ্টামো মনে হচ্ছিল এখন সেই কথাগুলিকেই খুব উঁচুদরের রসিকতা বলে মনে হতে থাকে। বব তার কথায় যতি দেওয়া মাত্র সে নির্দিষ্ট এবং সঠিক জায়গায় প্রয়োজনীয় আন্তরিকতা দিয়ে সঠিক পরিমাণ হাসি দিতে থাকে। নিজের অজান্তেই তার ভূমিকাটা খানিকটা স্তাবকের ভূমিকা হয়ে যায়।

বব তার কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল, "এস, তোমাকে তোমার অফিস দেখিয়ে দিই। আগেই সাবধান করে দিই, আসলে এটা শুধু নামেই একটা অফিস। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ইঁদুরের গর্ত। আমাদের ঝাড়ুদার বলেছে মাঝরাতে সে দেখেছে এই অফিসে সত্যিই ইঁদুর ঘোরাফেরা করে। অনেক চিন্তাভাবনা করে সামার স্টুডেন্টসদের জন্যে এরকম অফিস তৈরি করা হয়েছে। স্টুডেন্টসরা তাহলে ল্যাবরেটরিতে সময় কাটাতে পছন্দ করে।" বব আবার হা হা করে হাসতে শুরু করল এবং ববের কথাবার্তায় রিয়াজও শেষপর্যন্ত কৌতুক খুঁজে পেয়ে সমান জোরে হা হা করে হেসে উঠল।

রিয়াজের অফিসে পৌছানোর আগে বব হঠাৎ রিয়াজকে নিয়ে অন্য একটা অফিসঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। অফিসঘরটির দরজা ভেজানো এবং ভেতর থেকে পুরুষ এবং নারীকণ্ঠে কথাবার্তা শানা যাচ্ছে। ঠিক কী নিয়ে কথা বলছে বোঝা না গেলেও হালকা হাসাহাসির শব্দে আনন্দের সুরটুকু খুব স্পষ্ট। বব দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল— রিয়াজ দেখতে পেল চেয়ারে একটি মেয়ে বসে আছে, তার কাছাকাছি একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। একজন মানুষের ঠিক যত কাছে আরেকজনের দাঁড়িয়ে থাকা শোভন, মানুষটি তার চাইতে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রিয়াজ ও ববকে দেখে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মানুষটি একটু পিছিয়ে আসে।

বব রিয়াজকে বলল, "এই-যে দুইজন দেখছ এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এদের সাথে তোমার খুব ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে। সবসময় এদেরকে তোয়াজ করে রাখবে, নাহয় তোমার খুব বিপদ হবে।"

ববের কথা শুনে পুরুষমানুষটি খুব বিরক্ত হল। সে একজন টেকনিশিয়ান এবং সত্যিকার অর্থে সে অন্যদের টেকনিক্যাল ফাইফরমাশ খাটা জাতীয় কাজ করে। তার ভূমিকা প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষটি গলার স্বরে বিরক্তি চেপে রাখার কোনো চেষ্টা না করে বলল, "তোমার লম্বা ওয়েভ-লেংথের কথা ক্ষান্ত দাও দেখি—"

বব তাকে পুরোপরি উপেক্ষা করে রিয়াজকে বলল, "এ হচ্ছে হ্যারল্ড—আমাদের টেকনিশিয়ান। আর এই-যে মেয়েটিকে দেখছ তার নাম ক্রিস্টিনা। ক্রিস্টিনা আমাদের সিস্টেমস এডমিনিস্ট্রেটর। সে পাঁচটার সময় বাসায় যায় এবং ঠিক সাড়ে পাঁচটায় সিস্টেম ক্র্যাশ করে যায়। কোম্পানির কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে ক্রিস্টিনার একধরনের রোমান্টিক সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করা হয়।" বব কথায় একমুহূর্ত যতি দিয়ে রিয়াজকে দেখিয়ে বলল, "আর এ হচ্ছে রিয়াজ। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র। এই সামারে আমাদের সাথে কাজ করার জন্যে সে অনুগ্রহ করে রাজি হয়েছে।"

মেয়েটি একটি সুইভেল চেয়ারে বসেছিল, এবারে সে তাদের দিকে ঘুরে বসল এবং রিয়াজ প্রথমবার মেয়েটিকে সামনাসামনি দেখতে পেল। কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে মেয়েটিকে দেখে হঠাৎ রিয়াজের ভেতরের কিছু-একটা যেন নড়েচড়ে গেল। ঠিক কী সে জানে না, কিন্তু মেয়েটির কোনো একটা ব্যাপার হঠাৎ তার খুব একটি নিজস্ব সত্তাকে স্পর্শ করল। মেয়েটি বাড়াবাড়ি সুন্দরী নয়—কমবয়সী, দেহ এবং রূপ-সচেতন সাধারণ আমেরিকান মেয়ে। কিন্তু তবু তার কিছু-একটা ব্যাপার অত্যন্ত আকর্ষণীয়—সেটি কী রিয়াজ ধরতে পারল না। মেয়েটি পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে, সংক্ষিপ্ত স্কার্ট হাঁটুর ওপরে উঠে উরুর অনেকটুকু দেখা যাচ্ছে। দুই হাত মাথার পিছনে রাখায় মেয়েটির শরীরটি বাড়াবাড়ি সজীব। মাথায় বিন্যস্ত ঘন বাদামি চুল। রিয়াজ অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল সে তার ঠিক কোন জিনিসটি দেখে এত বিচলিত হয়েছে—তার সবুজ চোখ, নাকি চোখের দৃষ্টি; মেয়েটির ঠোঁট, নাকি ঠোঁটের কোণার হাসিটি; মেয়েটির দেহ, নাকি দেহের ভঙ্গি।

রিয়াজ হতচকিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল, তার মনোযোগ এত তীব্র যে সে একসাথে পুরো মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছিল না। তাই হঠাৎ করে একসময় আবিষ্কার করল মেয়েটি তার সাথে হাত মেলানোর জন্যে বসে থেকেই ডান হাতটা তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। রিয়াজ এগিয়ে গিয়ে

মেয়েটির হাত স্পর্শ করল, আর কী আশ্চর্য—হঠাৎ তার ইচ্ছে করল এক হাতে তার হাতটি ধরে রেখে অন্য হাতে মেয়েটির নরম ত্বকের ওপর হাত বুলিয়ে নিতে।

রিয়াজ অবশ্যি তার কিছুই করল না, হাত মিলিয়ে সপ্রতিভভাবে পিছিয়ে এল। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টেকনিশিয়ান হ্যারল্ডও যে হাত মেলানোর জন্যে হাত উঁচু করেছিল সেটি কীভাবে জানি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। একসময় লক্ষ করল সে ববের পিছু পিছু ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। বব তখনও কিছু-একটা বলছে, জ্ঞানগম্ভীর এবং চেষ্টা করে তৈরি-করা বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য—হ্যারল্ডের ভাষায় লম্বা ওয়েভ-লেংথের কথা। রিয়াজ হঠাৎ করে আর ববের কথায় মনোযোগ দিতে পারছিল না, মেয়েটি এইমাত্র তার কোনো একটি নিয়ন্ত্রণ নষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক কীভাবে সেটা ঘটেছে রিয়াজ সেটা বুঝতে পারল না।

রিয়াজ তখনো জানত না আগামী কয়েক সপ্তাহে ক্রিস্টিনা নামে এই মেয়েটির সাথে তার অত্যন্ত বিচিত্র একটি সম্পর্ক গড়ে উঠবে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক—যেটা সহজেই ভালোবাসা হতে পারত কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসা হবে না।

॥ দুই ॥

রিয়াজ প্রায় অন্ধকারের মাঝে হাতড়ে হাতড়ে বাসটিতে উঠে মাঝামাঝি একটা সিট বেছে নিয়ে জানালায় মাথা হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। তার ধারণা ছিল সে সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়বে, রাতে তার ঘুমাতে দেরি হয়েছে। সকালে বিকট আওয়াজের একটা এলার্মঘড়ি ব্যবহার করেও ঘুম থেকে উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছে। তার সমস্ত শরীর এখন ঘুমের জন্যে বুভুক্ষু হয়ে আছে—কিন্তু দেখা গেল সে সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল না। বাসে, ট্রেনে বা সেমিনারে জানালায় মাথা রেখে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘুমাতে পারে না। এরকম জায়গায় ঘুম আসে নিজের অজান্তে যখন তার জন্যে কোনোরকম প্রস্তুতি থাকে না এবং সাধারণত তখন সেই ঘুম ঠেকানোর কোনো উপায়ও থাকে না। রিয়াজ খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

পৃথিবীর যাবতীয় বাস বা রেলস্টেশনগুলির মাঝে মনে হয় একধরনের আত্মীয়তা আছে। মানুষ যখন কোথাও যায় কিংবা কোথা থেকে আসে—গন্তব্যস্থানে পৌছানোর আগে মনে হয় একধরনের অসহায়-অসহায় ভাব থেকে। তাদের সেই অসহায় অবস্থাটা মনে হয় বাস বা রেলস্টেশনে ফুটে ওঠে, এখানে সবকিছুতেই কেমন জানি এক ধরনের মনখারাপ-করা ঔদাসীন্য। এক কোণায় যে-নেশাসক্ত মানুষটি নোংরা কাপড় পরে গুটিগুটি মেরে বসে আছে সেটা খুব সহজেই ঢাকার ফকিরাপুলের একটা দৃশ্য হতে পারত।

বাস যখন ছাড়ার কথা তার থেকে বেশ খানিকটা দেরি করে ছাড়ল। শহরের ভিড় কাটিয়ে শেষপর্যন্ত যখন হাইওয়েতে উঠে গেল তখন রিয়াজ শেষপর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। এই ঘুমকে অবশ্যি সত্যিকারের ঘুম বলা যায় না, এটি ঘুমের একধরনের অশোভন অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের মাঝেও সমস্ত স্নায়ুকে শক্ত করে রাখতে হয় যেন জানালার শক্ত কাচে মাথা ঠুকে না যায় কিংবা পাশের মানুষটির ওপর ঢলে না পড়ে। এই ধরনের ঘুমে বাস্তব এবং ঘোর অবাস্তব কিছু জিনিসের একধরনের গুরুপাক মিশ্রণকে স্বপ্ন হিসেবে দেখা যায় এবং প্রত্যেকবার ঘুম ভেঙে যাবার পর আগেরটার সাথে সম্পর্কহীন সম্পূর্ণ নতুন আরেকটা স্বপ্ন শুরু হয়ে যায়। এভাবেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রিয়াজের নিউইয়র্ক শহর থেকে নিউজার্সিতে তার নতুন কর্মস্থলে পৌছে যাবার কথা ছিল। এভাবেই সে গত কয়েকদিন যাচ্ছে, সেখানে নামার কথা সেই জায়গাটিতে পৌছানোর কিছুক্ষণ আগে প্রত্যেকবার তার ম্যাজিকের মতো ঘুম ভেঙে গেছে।

আজ অন্য একটি ব্যাপার হল, তার ঘুম ভেঙে গেল অনেক আগে। বাসে বা ট্রেনে ঘুমানোর একটা পরীক্ষিত সূত্র আছে। যতক্ষণ বাস বা ট্রেন চলতে থাকে ততক্ষণ ঘুমানো যায়, সেটি থেমে গেলে ঘুমও চটকে যায়। আজকেও তাই হল, মাঝপথে হঠাৎ বাস থেমে গেল এবং সাথে সাথে রিয়াজ চোখ খুলে দেখল তারা গাড়ির পল্টন ময়দানে হাজির হয়েছে—সামনে, পিছনে, ডানে এবং বামে যতদূর দেখা যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি। মনে হয় আজকে টার্ন পাইকের একটা ঐতিহাসিক ট্রাফিক জ্যামে পড়েছে। রেডিও-টেলিভিশনের লোকজন নিশ্চয়ই এখন হেলিকপ্টারে ঘুরোঘুরি করে এই ট্রাফিক জ্যামের বর্ণনা দিতে দিতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে।

রিয়াজ বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল। সে এদেশে ছাত্র হিসেবে এসেছে এবং বরাবর ছাত্র হিসেবেই থেকেছে। এই প্রথমবার সামারে একটা ভদ্র চাকরি শুরু করেছে। দোকানে সাবান এবং শ্যাম্পু বিক্রি নয়, রীতিমতো বিখ্যাত জায়গায় গবেষণার কাজ। সেই কাজে যদি সময়মতো হাজির না হতে পারে সেটা রীতিমতো অশালীন বলে গণ্য হতে পারে। রিয়াজ একটু পরে-পরে তার ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল এবং যেটুকু প্রয়োজন তার থেকে বেশি ছটফট করতে লাগল। তার আশপাশে যারা বসে আছে তাদের সবার মাঝেই একধরনের গভীর শান্ত ও সমাহিত ভাব এবং তাদের দেখে মনে হয় পৃথিবীর কিছুতেই তাদের কিছু আসে যায় না। এই-যে বাসটি টার্ন পাইকের বিশাল ট্রাফিক জ্যামে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাতে তাদের কারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। রিয়াজ প্রথমে একটু বিস্মিত এবং কিছুক্ষণের মাঝেই কেমন জানি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। এই জাতির কি মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই? ভিতরে কি বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ছিটেফোঁটাও নেই? কেউ কি একবার একটু চিৎকার করেও দেখবে না?

রিয়াজ তার পাশে বসে থাকা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা দেখেছ?"

মানুষটি মধ্যবয়স্ক, চেহারায় একধরনের সহৃদয় ভালোমানুষ-ভালমানুষ ভাব আছে। চোখের ভুরু ওপরে তুলে বলল, "নিত্যিদিন এই হচ্ছে। কী যে হবে এই দেশের!"

রিয়াজ সবিস্ময়ে লক্ষ করল যদিও মানুষটির বাক্যটি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক বাক্য কিন্তু তাকে মোটেও সেটা নিয়ে হতাশ কিংবা বিচলিত মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে বিশাল গাড়ি-সমুদ্রের মাঝে একটা ছোট দ্বীপের মতন এই বাসটাতে বসে থাকা ব্যাপারটি এই লোকটি বেশ উপভোগই করছে। পকেট থেকে ছোট একটা পেপারব্যাক বই বের করে সে পড়তে শুরু করল। এরকম একটা পরিবেশে একজন মানুষ কী ধরনের বই পড়তে পারে জানার জন্যে রিয়াজ উঁকি মেরে বইটার নাম দেখার চেষ্টা করে বেশি সুবিধে করতে পারল না। মানুষটা এই পথে যাতায়াত করার যাবতীয় কায়দাকানুন শিখে ফেলেছ বলে মনে হয়।

রিয়াজ পাশে বসে থাকা এই পাঠকমানুষের কাছে সত্যিকারের কোনো সহানুভূতি না পেয়ে ড্রাইভারের শরণাপন্ন হল। লোকটার কাছে একটা টেলিফোন রয়েছে, অনেকক্ষণ থেকে সেটা কানে লাগিয়ে কার সাথে জানি

কথা বলছে। রিয়াজ গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল, "ড্রাইভার সাহেব—কী মনে হয়? কখন পৌছাব?"

ড্রাইভার সহৃদয় গলায় হেসে বলল, "আজকে পৌছানোর আশা ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দেব?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"টানেলগুলির অবস্থা খুব খারাপ। সামনে খুব খারাপ একটা একসিডেন্ট হয়েছে। ব্রিজে ধাক্কা খেয়ে ট্রাক উল্টে গেছে। ডিজেল-এর ট্রাক, সারা রাস্তা ডিজেলে থই থই করছে।"

"সর্বনাশ! কী করে একসিডেন্ট হল?"

"ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল।"

"ঘুমিয়ে পড়েছিল?"

"হ্যাঁ। সারারাত ডিউটি করে আবার সকালে কাজে বের হয়েছে। ঘুম তো পেতেই পারে।"

সামনের দিকে বসে থাকা একজন বয়স্কা মহিলা বলল, "তুমি সারারাত ডিউটি করনি তো?"

ড্রাইভার মধ্যবয়স্ক একজন কালো মানুষ, সবগুলি দাঁত বের করে হেসে বলল, "না ম্যাডাম। আমি সারারাত খাটের মাঝে লম্বা হয়ে ঘুমিয়েছি।"

খাটের মাঝে লম্বা হয়ে ঘুমানো একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, এর মাঝে হাসির কিছু থাকার কথা নয়। কিন্তু ড্রাইভারের এই কথা শুনে বাসের সব মানুষ কেন হেসে উঠল রিয়াজ বুঝতে পারল না। মাঝপথে আটকে-থাকা বাসের মাঝে এখন টেনশান জমে ওঠার কথা, মানুষের মেজাজ গরম হবার কথা, ঝগড়াঝাঁটি শুরু হবার কথা। রিয়াজের স্পষ্ট মনে আছে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবার পথে এক বাস-কন্ডাক্টর অনেকক্ষণ বাসযাত্রীদের সাথে খ্যাচ-খ্যাচ করছিল, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই চিকন লিকলিকে একজন যাত্রী উঠে এসে কন্ডাক্টরের কলার ধরে মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি। কন্ডাক্টর ছিটকে পড়ল নিচে। তখন অন্যসব যাত্রী উঠে এসে কন্ডাক্টরকে ধরে সে কী মার! সাথে সাথে বাস থামানো হল, ড্রাইভার কন্ডাক্টর হেলপারকে টেনে নামানো হল। অর্ধেক যাত্রী পারলে তখন-তখনই বাসকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কী উত্তেজনার সময় ছিল তখন—আর এখন এই ভদ্রলোকের দেশে সবাই চুপচাপ বসে আছে।

রিয়াজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দেশ হলে এখনই সে বাস থেকে নেমে যেত, হেঁটে ট্রাফিক জ্যামটা পার হয়ে একটা রিকশা, নাহয় স্কুটার নিয়ে সামনে থেকে আরেকটা বাস ধরত। এখানে সে রিকশা-স্কুটার পাবে কোথায়? হেঁটে যাবে কোথায় এই ফ্রি-ওয়েতে?

রিয়াজ রেগে রেগে ক্লান্ত হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেয়। বাসের জানালা দিয়ে উদাস-চোখে সে বাইরে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করে তারও মনে হতে থাকে কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।

গাড়ির জটলা ভেদ করে বাসটি যখন কোম্পানি অফিসে নামিয়ে দিল তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। অফিসের বড় গেটের সামনে তাদের গ্রুপের সবার সাথে দেখা হয়ে গেল, সবাই লাঞ্চ খাবার জন্যে বের হয়েছে। ক্যাফেটারিয়ার খাবারে অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মাঝে সবাই মিলে বাইরে খেতে যায়। আজকে দলটি অবশ্যি বেশ ছোট—বব, জিম, হ্যারল্ড এবং ক্রিস্টিনা। বব রিয়াজকে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, "সারা রাত ওয়াইল্ড পার্টি করেছিলে বুঝি?"

রিয়াজ কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "পার্টি না। বাসে দেরি হয়ে গেল। রাস্তায় এমন ট্রাফিক জ্যাম যে সাড়ে চার ঘণ্টা লেগেছে আসতে।"

জিম চোখ কপালে তুলে বলল, "সা-ড়ে-চা-র-ঘ-ণ্টা?"

"হ্যা।"

বব হিসেবে করে বলল, "আসতে লেগেছে সাড়ে চার ঘণ্টা, যেতে আরো সাড়ে চার ঘণ্টা। একদিনে তো নয় ঘণ্টা রাস্তাতেই কেটে গেল। তাহলে বাকি থাকল কী?"

"সবদিন তো এত দেরি হয় না। এমনি তো দুই ঘণ্টায় চলে আসি।"

"দুই ঘণ্টা? সেটাই কম কী? দিনে চার ঘণ্টা বের হয়ে যায়।"

জিম মাথা নেড়ে বলল, "তোমার শুধুশুধু এত কষ্ট করে এত দূর থেকে আসার দরকার কী? এই সামারটাতে তুমি নিউ জার্সি থেকে যাওনা কেন, তাহলেই তো কোনো সমস্যা হয় না।"

"তা ঠিক।"

"যাই হোক, আমরা এখন বাইরে খেতে যাচ্ছি। তুমি যাবে?"

এত দেরি করে কাজে এসে এখনই আবার একটি দীর্ঘ লাঞ্চে যেতে রিয়াজের ইচ্ছে করছিল না। কিছু-একটা অজুহাত দিয়ে 'না' করতে গিয়ে সে থেমে গেল। তাদের ছোট দলটিতে ক্রিস্টিনাও আছে, গাঢ় নীল রঙের

ছোট একটা স্কার্ট পরেছে, কী চমৎকার যে লাগছে দেখতে! মেয়েটার কাছাকাছি বসে লাঞ্চ করা যাবে ভেবেই রিয়াজ রাজি হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে খেতে?"

বব উজ্জ্বল-চোখে বলল, "ভেবেছিলাম ভিয়েৎনামিজ রেস্টুরেন্টে যাব। কিন্তু তুমি যেহেতু আছ চল একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে যাই।"

ক্রিস্টিনা বলল,"কিন্তু রিয়াজ তো ইন্ডিয়ান না। রিয়াজ বাংলাদেশী।"

জিম বলল, "খাবার নিশ্চয়ই একধরনের হবে। হবে না?"

রিয়াজ মাথা নাড়ল। বলল, "মোটামুটি একধরনের।"

"চল তাহলে যাই। শুনেছি রুট থার্টি ফাইভের ওপর নাকি একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে।"

"চল যাই।"

ক্রিস্টিনা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাদের বলে দেবে কেমন করে খেতে হবে।"

রিয়াজ দ্রুত ভাবার চেষ্টা করল কীভাবে ক্রিস্টিনার কথার একটা বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু কিছুই ভেবে পেল না—উল্টো আবিষ্কার করল সে বলছে, "হ্যাঁ মানে ইয়ে খাওয়া তো মানে ইয়ে, সবাই—"

কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে তার ইচ্ছে করল নিজের পাছায় একটা লাথি কশাতে। মানুষের পা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু নিজের পা দিয়ে নিজের পাছায় লাথি কশানো তার মাঝে একটি নয়।

রুট থার্টি ফাইভের যে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে তারা খেতে ঢুকল সেটি সাজানো-গোছানো, কিন্তু পুরো সাজসজ্জাতে রুচির অভাবটুকু খুব স্পষ্ট। দেয়ালে মোগল রাজা-রানীর চকচকে রঙিন ছবি, ঘরের কোণায় কোণায় সোনালি রঙের পিতলের বাসন-কোসন ঘষে ঘষে চকচকে করে রাখা হয়েছে। অল্প খানিকটা জায়গায় অনেকগুলি চেয়ার-টেবিল গাদাগাদি করে পেতে রেখেছে। টেবিলে শস্তা টেবিলক্লথ, সবুজ রঙের ছোট ছোট গ্লাস। একসাথে বেশ কয়েকজনকে ঢুকতে দেখে রেস্টুরেন্টের মালিক মুখে বিশুদ্ধ ভারতীয় কায়দায় বিগলিত হয়ে যাবার ভঙ্গি করে এগিয়ে এল।

দুটি ছোট টেবিলকে একসাথে লাগিয়ে টেবিলটা খানিকটা বড় করে তাদের সবার একসাথে বসার ব্যবস্থা করা হল। রেস্টুরেন্টের মালিকের স্ত্রী পানির জগ নিয়ে পানি ঢালতে আসে, খাবারের অর্ডার নিতে আসে মালিকের শালা অথবা ভায়রা ভাই। কাউন্টারে সাজগোজ করে কমবয়সী

যে-মেয়েটি বসে আছে সে নিশ্চয়ই মালিকের মেয়ে। পুরোটাই একটা পারিবারিক ব্যবসা, আয়ের পুরোটুকুই লাভ!

খেতে বসে ভারতীয় ঐতিহ্য-সভ্যতা এইসব বড় বড় জিনিস নিয়ে আলোচনা শুরু হল। দেখা গেল বব প্রায় সবকিছুর মতো এই বিষয়েও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে একাই 'কর্মে অধিকার তার ফলে নয়' কিংবা 'কর্মফল ভোগ না-করা পর্যন্ত নির্বাণ নেই'-এই ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে যেতে থাকে। বব সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা জানার জন্যে সবাই একটু পরে-পরে উৎসুক চোখে রিয়াজের দিকে তাকাতে থাকে—তাকে সবাই ভারতীয় দর্শনে বিশেষজ্ঞ ভেবে নেয়ায় সে বিশেষ বিপণ্ন অনুভব করে। রিয়াজ মোটামুটি চাঁছাছোলা মানুষ, দর্শন দূরে থাকুক সাহিত্য বা সঙ্গীতের মতো ব্যাপারগুলিতেও তার বিশেষ কৌতূহল নেই। দেশে বড় লেখক কে, কার বই বেশি বিক্রি হয় কিংবা ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর নাম কী জিজ্ঞেস করলেও সে বেকায়দায় পড়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে দর্শনে অন্য কারও সেরকম উৎসাহ নেই এবং আলোচনা আবার অপরাধ, টেলিভিশন, সিটকম, গাড়ি এই ধরনের মুখরোচক আমেরিকান আলোচনায় ফিরে এল। আলোচনার একপর্যায়ে আবার রিয়াজের নিউইয়র্ক থেকে এখানে চলে আসার ব্যাপারটি উঠে আসে। জিম চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বলল, "সামারের তিনটা মাসের জন্যে রিয়াজের একটা থাকার জায়গা পাওয়া যায় না?"

তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করে কোনো সহজ সমাধান পাওয়া গেল না, বরং কমবয়সী অবিবাহিত পুরুষমানুষের থাকার জায়গা নিয়ে যে কী বড় সমস্যা সেটি নিয়ে নানা ধরনের ভীতিপ্রদ আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কমবয়সী অবিবাহিত পুরুষমানুষেরা কী কী অপকর্ম করে, বব তার একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে চাচ্ছিল, ঠিক তখন ক্রিস্টিনা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ বিকেলে আমার কোনো কাজ নেই। তুমি যদি চাও তোমাকে নিয়ে ঘুরে দেখতে পারি কোনো থাকার জায়গা পাওয়া যায় কি না।"

রিয়াজ একেবারে হকচকিয়ে গেল। সত্যি সত্যি একটা বাসা ভাড়া করে নিউজার্সি থাকার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। বন্ধুবান্ধব সবাই নিউইয়র্কে, তাছাড়া সামারে কিছু বাড়তি অর্থোপার্জন করবে তার পুরোটাই যদি বাড়িভাড়ায় দিয়ে দেয় তাহলে তার শেভি সিভেট কেনা হবে কেমন করে? সে অবশ্যি এসব কিছু বলল না, তন্দুরি চিকেন নামের ভয়াবহ রক্তবর্ণের মুরগির রান চিবুতে চিবুতে মুখে যতটুকু সম্ভব গাম্ভীর্য ধরে রেখে

ক্রিস্টিনাকে বলল, "হ্যাঁ, আমার সময় আছে। তোমার সত্যি কোনো অসুবিধে নাই তো?"

"না, নেই। বোলিং টুর্নামেন্ট মাত্র শেষ হল, এখন সোমবার বিকেল ফাঁকা। অফিস শেষে তোমাকে নিয়ে বের হব।"

"ঠিক আছে।"

বব আবার লম্বা ওয়েভ-লেংথের কথা বলতে শুরু করছিল কিন্তু বোলিং টুর্নামেন্ট নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হওয়ায় সেটা চাপা পড়ে গেল। রিয়াজ বেশ কৌতুকের সাথে লক্ষ করল কোম্পানির লোকজন তাদের এই বোলিং টুর্নামেন্টটায় খুব গুরুত্ব দেয়।

ঠিক পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ক্রিস্টিনা রিয়াজকে তার অফিস থেকে নিয়ে বের হয়ে এল। বিশাল পার্কিং লটের এককোণায় টুকটুকে লাল রঙের একটা সেলিকা সুপ্রা পার্ক করে রাখা। গাড়িটি চমৎকার, রিয়াজের মনে হল এরকম চমৎকার একটি গাড়ি না হলে সেটা ক্রিস্টিনার সাথে একেবারেই মানাত না। পকেট থেকে একটা চাবি বের করে কোথায় চাপ দিয়ে সে দূর থেকেই গাড়ির দরজার তালা খুলে ফেলল। রিয়াজ ডানদিকের দরজা খুলে গাড়িতে বসে। গাড়িটি তুলনামূলকভাবে নিচু। সিটে বসার পর মনে হল সে বুঝি মাটিতে বসে পড়েছে। ক্রিস্টিনা চাবি ঢুকিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে পার্কিং লট থেকে বের হয়ে রাস্তায় উঠে এল। রিয়াজ কীভাবে একটা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করবে সেটা নিয়ে চিন্তা করছিল, তার আগেই ক্রিস্টিনা বলল, "আমি অফিস থেকেই কয়েক জায়গায় ফোন করেছি। আনফরচুনেটলি আশপাশে খুব বেশি বাসা নেই। তুমি যেহেতু এখনো গাড়ি কেনোনি তুমি তো বেশিদূরে যেতেও পারবে না।"

"না।"

"কপাল ভালো থাকলে সামারে বেশি বৃষ্টি হবে না। তাহলে তুমি সাইকেলে আসতে পারবে।"

"তা পারব।"

"রাস্তাঘাট অবশ্যি ডেঞ্জারাস। সাইকেলে আসতে হলে জীবনটা মোটামুটি হাতে নিয়ে আসতে হবে। যারা গাড়ি চালায় তারা সাইক্লিস্টদের দুই চোখে দেখতে পারে না, জানো তো?"

"তাই নাকি?"

রাস্তাঘাট, যানবাহন, আবহাওয়া—এইসব নিয়ে আলোচনা হতে থাকে এবং রিয়াজ হুঁ-হাঁ জাতীয় শব্দ করে উত্তর দিতে থাকে। কীভাবে আলোচনাটাকে পূর্ণবয়স্ক মানুষের আলোচনার পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় সেটা ভেবে ঠিক করার আগেই ক্রিস্টিনা গাড়িটা ছোট একটা এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের মাঝে ঢুকিয়ে নিল। সে নিশ্চয়ই এখানে আগেও এসেছে, কারণ গাড়ি থেকে নেমে সে সোজা হেঁটে একটা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দরজায় শব্দ করতেই থুড়থুড়ে এক বুড়ি দরজা খুলে দিল। বুড়ির চোখে ভারী চশমা, তবুও খুব ভালো দেখতে পায় না বলে মনে হল। একেবারে ক্রিস্টিনার কাছে এসে তাকে দেখার চেষ্টা করতে থাকে।

ক্রিস্টিনা বলল, "তোমাকে আমি ফোন করেছিলাম। তুমি বলেছিলে একটা এপার্টমেন্ট খালি আছে।"

'হ্যাঁ।' বুড়ি মাথা নেড়ে বলল, "তোমার বয়ফ্রেন্ডের জন্যে ?"

রিয়াজের কান লাল হয়ে উঠল কিন্তু ক্রিস্টিনার কোনো ভাবান্তর হল না, বরং সকৌতুকে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আমার বয়ফ্রেন্ডের জন্যে।"

"এপার্টমেন্টটা ছোট, তোমাদের পছন্দ হবে কিনা জানি না। তবে ভাড়া কম।"

"কত ভাড়া ?" রিয়াজ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

"ছয়শ ডলার।"

ছয়শ ডলার! রিয়াজ ভেতরে ভেতরে আঁতকে ওঠে, ছয়শ ডলার কম হল নাকি ?

বুড়ি বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলতে বলতে অনেক সময় নিয়ে তার দেরাজ থেকে চাবির গোছা বের করে একটা একটা করে চোখের কাছে নিয়ে কিছু-একটা দেখতে থাকে। মানুষ বেশি বুড়ো হয়ে গেলে সহজ কাজটিই কী কঠিন হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ঠিক চাবিটা খুঁজে পেয়ে বুড়ি আবার বিড়বিড় করে কথা বলে তাদেরকে উপরে নিয়ে যায়। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সে হাঁপাতে তাকে এবং দরজা খুলে দিয়ে খানিকক্ষণ দরজা ধরে বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে তাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিল।

এপার্টমেন্টটি অত্যন্ত দীন হীন। আগে যে ছিল সে নিশ্চয়ই একজন অপরিষ্কার এবং খবিশ টাইপের মানুষ, সারা এপার্টমেন্টে তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ময়লা রং-ওঠা দেওয়াল, নিচু ছাদ, বিবর্ণ কার্পেট, অন্ধকার ঘর—সব মিলিয়ে একধরনের দূষিত পরিবেশ। রান্নাঘরে ঢুকতেই ছোট

ছোট কিছু তেলাপোকা এদিকে-সেদিকে লুকিয়ে গেল। বুড়ি ম্যানেজার ঘরের এখানে-সেখানে হাত দিয়ে ঝেড়ে এপার্টমেন্টটা একটু দর্শনযোগ্য করার ক্ষীণ একটা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। ক্রিস্টিনা রিয়াজের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "তুমি এখানে থাকতে চাইলেও আমি থাকতে দেব না।"

রিয়াজ হেসে বলল, "ভয় পেয়ো না। আমি থাকতে চাইব না!"

এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স থেকে বের হয়ে ক্রিস্টিনা রিয়াজকে নিয়ে আরো কয়েকটা জায়গায় গেল। রিয়াজ অবশ্যি কিছুক্ষণেই বুঝে গেল এভাবে এক বিকেলে খোঁজাখুঁজি করে একটা থাকার জায়গা বের করার কোন সম্ভাবনাই নেই। নিউজার্সির এই এলাকাটা চাকরিজীবীদের জন্যে। ছাত্রদের মতো স্বল্প-আয়ের মানুষজনের থাকার উপযোগী কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। তবে ঘণ্টাতিনেক সময় ক্রিস্টিনার সাথে কাটিয়ে সে মেয়েটা সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস আবিষ্কার করল, প্রথমত মেয়েটার লেগে থাকার একটা গোঁ আছে, পুরোপুরি অর্থহীন জেনেও সে একটু চেষ্টা করে দেখে। কোনো কিছুই সে এমনিতে ছেড়ে দেয় না। এরকম একগুঁয়েমি ভাব থাকার পরও মেয়েটা হাবাগোবা জাতীয় নয়, তার ভিতরে একধরনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা আছে। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হল রিয়াজের কেন জানি মনে হতে থাকে ক্রিস্টিনা তার সবকিছু বুঝে ফেলছে, তার ভেতরকার কোনোকিছুই যেন লুকানো-ছাপানো নেই। সে কারণে প্রথম-প্রথম সে ক্রিস্টিনাকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে যেরকম বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলার চেষ্টা করছিল কিছুক্ষণের মাঝেই সেটা বন্ধ করে দিল। যখন সহজ স্বাভাবিক কথা বলতে শুরু করে তখন কথা বলার পুরো ব্যাপারটি হঠাৎ করে খুব সহজ হয়ে ওঠে। যে-কোনো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার মানুষের মতো মেয়েটি খুব কৌতূহলী। সে আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রশ্ন করে না, জানার জন্যে প্রশ্ন করে। সাধারণ আমেরিকানদের মতো মেয়েটা বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, বাংলাদেশ কোথায় সে জানে। এটা-যে ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য নয় সেটাও তাকে বলে দিতে হল না। রিয়াজ সবচেয়ে অবাক হল যখন সে আবিষ্কার করল উনিশ-শ একাত্তর সালে যে এদেশে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক গণহত্যা হয়েছিল ক্রিস্টিনা সেটাও জানে। তবে গণহত্যার সংখ্যাটি বলল অনেক কম, এক লাখের কাছাকাছি। রিয়াজ যখন জানাল

সংখ্যাটি প্রায় তিন মিলিয়ন অর্থাৎ ত্রিশ লাখের কাছাকাছি তখন সে অবাক হয়ে রিয়াজের দিকে তাকাল; বলল, "কী বলছ তুমি ?"

"হ্যাঁ।"

"এটা তো অবিশ্বাস্য সংখ্যা!"

রিয়াজ হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমাদের দেশে কত মানুষ তুমি জানো না! কেউ মেরে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।"

"তখন জনসংখ্যা কত ছিল ?"

রিয়াজ মাথা চুলকে বলল, "মনে হয় সত্তুর মিলিয়ন।"

"সত্তুর মিলিয়ন মানুষের মাঝে তিনি মিলিয়নকে মেরে ফেলেছিল ? প্রায় প্রতি পরিবারেই কেউ-না-কেউ মারা গেছে ?"

"অনেকটা সেরকম।"

ক্রিস্টিনা ঘুরে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার পরিবারের কেউ মারা গিয়েছিল ?"

"না।" রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "অমি তখন খুব ছোট। তিন-চার বছর বয়স, ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতেই পারিনি। কিছু মনেও নেই।"

"মনে নেই ?" ক্রিস্টিনা হেসে বলল, "আমার তো তিন বছরের কথা বেশ ভালোই মনে আছে। বাবা ড্রিংক করে এসে মা'কে ধরে সে কী মার!"

রিয়াজ একটু অবাক হয়ে ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল। এরকম একটি কথা এত সহজে বলতে পারল ? তার বাবা-মা এখন কী করছে জানার কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারল না। ক্রিস্টিনা বুদ্ধিমতী মেয়ে—একটা কথা বলা হলে সেটা নিয়ে কৌতূহল থাকতে পারে ভালো করে জানে, তাই সে কৌতূহল মিটিয়ে দিল; বলল, "বাবা অবশ্যি বেশিদিন মাকে পিটাতে পারেনি। মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে একসিডেন্ট করে ফিনিশ হয়ে গেছে।"

"তোমার মা ?"

"আরেকটা বিয়ে করেছে। আমার দুই নম্বর বাবাটা ভালোই ছিল। তবে আমি যখন টিন-এজার হয়ে গেলাম, তখন সমস্যা শুরু হল।"

"কী সমস্যা ?"

"কী জানি। তোমরা পুরুষমানুষেরাই বলতে পারবে, কমবয়সী মেয়ে দেখলেই কেমন জানি ছোঁকছোঁক করতে থাকে।"

রিয়াজ আড়চোখে ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল, ঠিক কী বলতে চাইছে মেয়েটি ? সৎবাবা কার দিকে ছোঁকছোঁক করত ? প্রশ্ন করে খোলাসা করে নেয়া ঠিক হবে কিনা রিয়াজ বুঝতে পারল না।

ক্রিস্টনা জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা-মা কী করেন?"

"বাবা চাকরি করেন। মা হাউজওয়াইফ।"

"তোমাদের কালচারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা একটু অন্যরকম।"

"হ্যাঁ। মায়েরা সাধারণত একটু বেশি সহ্য করে।"

"তোমার বাবা-মায়ের সম্পর্ক কীরকম?"

"ভালো। আমার মা আসলে একেবারে বেশি ভালোমানুষ। এত শাদাসিধে। এত—" রিয়াজ হঠাৎ কথা শেষ না করে থেমে গেল।

ক্রিস্টিনা গাড়ি চালাতে চালাতে রিয়াজের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "এত?"

রিয়াজকে হঠাৎ কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়। তাকে দেখে মনে হতে থাকে সে যেন হঠাৎ করে কিছু-একটা জিনিস মনে করার চেষ্টা করছে কিন্তু মনে করতে পারছে না। ক্রিস্টিনা একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হল?"

"তোমাকে একটু আগে বলেছিলাম না সেভেন্টি ওয়ানে আমার পরিবারের কেউ মারা যায়নি?"

"হ্যাঁ।"

"আসলে সেটা সত্যি নয়। আমার মা মারা গিয়েছিলেন। আমার নিজের মা। রিয়াজ দুর্বলভাবে হেসে বলল, "কী আশ্চর্য! এরকম একটা কথা আমি ভুলে গেলাম কেমন করে? এখন যিনি আছেন তিনি আমার সৎ মা।"

"তোমার সৎমা?"

"হ্যাঁ। আসল মায়ের কথা আমার কিছু মনে নেই। আমার সৎমা-ই আসলে আমাকে বড় করেছে। একজন সাংঘাতিক মহিলা।"

ক্রিস্টিনা মাথা নাড়ল, "নিশ্চয়ই সাংঘাতিক মহিলা। না হলে তুমি নিজের মায়ের কথাও ভুলে যাও কেমন করে?"

রিয়াজ কিছু না বলে চুপ করে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। ক্রিস্টিনা জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে তোমার মা মারা গিয়েছিলেন?"

"জানি না। মনে নেই আমার।"

রিয়াজ চুপ করে বসে রইল। সত্যিই কি মনে নেই? সে চিৎকার করে কাঁদছে, তাকে কেউ একজন শক্ত করে ধরে রেখেছে আর একজন মহিলা নিষ্পলক-চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছে কেউ—তখনো নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে, মায়ের কথা মনে করার

চেষ্টা করলেই কী এরকম একটা দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে আসে না ?

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলল, তার মস্তিষ্ক এই স্মৃতিটুকু আড়াল করে রেখেছে কেন ? তার মা কে কেমন করে মেরেছে সে কোনদিন জানতে চাইল না কেন ? রিয়াজ হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল—তার নিজের মা নিয়ে তার কোনো কৌতূহল নেই কেন ?

ক্রিস্টিনা কিছু একটা বলছে, রিয়াজ মনোযোগ দিচ্ছিল না বলে বুঝতে পারছে না। সে ঘুরে ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কী বলছ ?"

বলছিলাম, "তুমি আমার থেকে লাকি। আমার নিজের মা ছিল কিন্তু কখনো আমার দিকে নজর দেয়নি। তোমার সৎমা কিন্তু তুমি কখনো টের পাওনি।"

"হুঁ।"

"তোমার ভাইবোন আছে ?"

"হু।"

"কতজন ?"

"একজন। বোন।"

"ছোট না বড় ?"

"ছোট।"

"তার মানে তোমার সৎবোন। তাই না ?"

রিয়াজ একটু চমকে উঠল—শিউলি তার সৎবোন। সত্যিই তো! জীবনের এতগুলি বছর পার করে দিল, কখনো মনে হয়নি শিউলি সৎবোন। কী খারাপ শোনায় কথাগুলি—সৎমা, সৎবোন—ছিঃ! রিয়াজ জোর করে সবকিছু মাথা থেকে বের করে দিল, বলল, "আসলে কিছু আসে যায় না। আমার একজন মা আর একজন বোন। এরা সৎমা, আর সৎবোন হতে পারে কিন্তু খাঁটি মা খাঁটি বোন।"

ক্রিস্টিনা মাথা নাড়ল বলল, "ঠিক বলেছ, সারা পৃথিবীতে যে-মানুষটা আমকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসত সেটা হচ্ছে আমার সৎবাবার আগের পক্ষের স্ত্রী! কী আশ্চর্য না ?"

রিয়াজ মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল যে ব্যাপারটি আশ্চর্য।

"তোমাদের দেশের পরিবারগুলি তো খুব ঘনিষ্ঠ হয়। তোমার বাবা-মা-বোনের সাথে যোগাযোগ আছে না ?"

"আছে। আমার মা প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখে।"

"প্রতি সপ্তাহে ?" ক্রিস্টিনা হেসে বলর, "ফাজলামি করছ ?"

"না, ফাজলামি না। সত্যি। প্রতি সপ্তাহে। আমি লিখি আর না লিখি, আমার মা নিয়ম করে চিঠি লিখে।" রিয়াজ ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আমার মায়ের পড়াশোনা খুব বেশি নয়, চিঠিটা খুব হাই কোয়ালিটি হয় না। বানান ভুল থাকে, ভুল গ্রামার থাকে। কিন্তু আমার মা হাল ছাড়েন না, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যান।"

"কী লিখেন ?"

"রাজ্যের খবর। আমার দূর-সম্পর্কের চাচার ছোটছেলের বিয়ের খবর, আমার বোনের বান্ধবীর মায়ের হিস্টারক্টমির খবর। বাসার নাইট কুইন ফুল ফোটার খবর, বাবার বন্ধুর প্রমোশনের খবর, বাজারে জিনিসপত্রের দামের খবর।"

ক্রিস্টিনা হেসে ফেলল, বলল, "তোমার মা তোমাকে খুব ভালোবাসেন।"

"কী করে বুঝলে ?"

"চিঠির বিষয়বস্তু শুনে।"

রিয়াজ কিছু বলল না। ক্রিস্টিনা ট্রাফিক লাইটে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা কোনো চিঠি লিখে না ?"

"বাবা বছরে এক-আধটা। ইংরেজিতে অফিশিয়াল চিঠি লিখে—'আশা করছি তোমার পড়াশোনা ভালো হচ্ছে', 'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন' এই টাইপের চিঠি।"

"আর বোন ?"

"সে দু-তিন মাসে এক-আধটা চিঠি লিখে। তবে সেই চিঠিগুলি হয় বিশাল। ষোল পৃষ্ঠার-আঠার পৃষ্ঠার চিঠি।"

"বল কী ?"

"হ্যাঁ।"

"কী লিখে তোমার বোন ?"

"কিছু লিখে না। কোনো খবর থাকে না, কোনো তথ্য থাকে না। স্রেফ আবোলতাবোল কথাবার্তা! একেবারে খাঁটি পাগলামো। আমার মায়ের চিঠির একেবারে উল্টা।"

"তোমার বোন কত বড় ?"

"এই বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে।"

"কী সুইট!" ট্রাফিক লাইট সবুজ হতেই এক্সেলেটর চেপে গাড়িটা বের করে ক্রিস্টিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, "তুমি কী লাকী!"

রিয়াজ একটু অবাক হয়ে বলল, "কী দেখে তোমার এই ধারণা হল?"

"এই-যে তোমার একটা মা আছে যে প্রতিসপ্তাহে ভুল গ্রামারে চিঠি লিখে। একটা বোন আঠার পৃষ্ঠার চিঠি লেখে, তার মাঝে কোনো খবর নেই! একজন বাবা ইংরেজিতে ফর্মাল চিঠি লিখে। একটা ফ্যামিলি। আমি কখনো ফ্যামিলি পেলাম না।"

এতক্ষণ হালকা কথাবার্তা হচ্ছিল, হঠাৎ করে ক্রিস্টিনার এরকম একটা আবেগতাড়িত কথা শুনে রিয়াজ একটু হকচকিয়ে গেল। কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না। ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটির মুখে এক ধরনের দুঃখের ছাপ। রিয়াজ গভীর কথাবার্তায় পারদর্শী নয়, তাই সেদিকে গেল না। পরিবেশটাকে সহজ করার চেষ্টা করে বলল, "তোমার তো পুরো জীবনই পড়ে আছে! একটা ফ্যামিলি তৈরি করা এমন কী কঠিন?"

"কঠিন। আমি চেষ্টা করে এর মাঝে দাগা খেয়েছি।"

রিয়াজ আবার অবাক হয়ে ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল—এই মেয়েটা মনে হচ্ছে আসলেই ঘরপোড়া গরু। রিয়াজ কিছু জিজ্ঞেস করবে কি না বুঝতে পাছিল না, তার আগেই ক্রিস্টিনা হঠাৎ একরকম জোর করে হেসে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ কিসের পাল্লায় পড়লাম! জোর করে দুঃখের কাঁদুনি শোনানো শুরু করেছে।"

"না—না—"

"ভয় পেয়ো না। আমার পার্সোনাল যন্ত্রণার কথা তোমার শুনতে হবে না।"

"না, মানে—"

"বল, তোমায় কোথায় নামিয়ে দেব?"

রিয়াজ বুঝতে পাল ক্রিস্টিনা ব্যাপারটি শেষ করে দিতে চাইছে। সে আর এগুলো না, বলল, "রেলস্টেশনে, বাসস্টেশনে যেটা তোমার জন্যে কাছে হয়।"

"দুই-ই সমান।"

"তাহলে রেলস্টেশনে। ট্রাফিক জ্যামে পড়তে হবে না।"

"হ্যাঁ। ট্রেনে যেতে আমারও বেশ লাগে। একটা লম্বা ক্রস কান্ট্রি ট্রিপ নেব একবার।"

দুজনে আবার কথা বলতে থাকে, মোটামুটি অর্থহীন ভদ্রতার কথা, কিন্তু হঠাৎ করে দুজনেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। রিয়াজের ঘুরেফিরে তার আপন মায়ের কথা মনে হতে থাকে, যে মায়ের কথা তার মনে নেই, যার জন্যে তার বুকের ভিতর কোনো ভালোবাসা নেই।

রিয়াজ তখনো জানত না তার এই অপরিচিতা জন্মদাত্রী মাতাকে নিয়ে তার জন্যে কতবড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

॥ তিন ॥

নতুন কোম্পানিতে দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। এক মাসে রিয়াজ মোটামুটিভাবে তার কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। বড় কোম্পানিতে কাজ করা নিয়ে তার যেরকম একটা ভয়-ভয় ভাব ছিল সেটা কেটে গেছে। ববের কথা সত্যি বের হয়েছে, যদিও সে কাগজপত্রে জিমের সাথে কাজ করে কিন্তু তার সাথে দেখা বলতে গেলে হয়ই না। কাজের তদারকি করে বব, মানুষটির কথাবার্তায় জোর করে বসানো বুদ্ধিমত্তার একটা ভান থাকলেও কাজের বেলায় সে অত্যন্ত ছিমছাম। কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে সেসব নিয়ে তার ভিতরে কোনো অস্পষ্টতা নেই। গ্রাফিক্সের কাজ করতে গিয়ে তার ক্রিস্টিনার সাথে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। ক্রিস্টিনার কলেজের কোনো বড় ডিগ্রি নেই কিন্তু নিজের কাজটুকু খুব ভালো জানে।

এর মাঝে এক-দুইবার ক্রিস্টিনা রিয়াজকে নিয়ে বাসা খুঁজতে বের হয়েছিল, কোনোবারই থাকার উপযোগী কিছু খুঁজে পায়নি। সারা বিকেল ঘোরাঘুরি করে শেষপর্যন্ত দুজন ডানকিন ডোনাটে বসে কফি ডোনাট খেয়ে গল্পগুজব করে সময় কাটিয়েছে। রিয়াজ ঠিক করে রেখেছে ক্রিস্টিনাকে নিয়ে একদিন ভালো একটা রেস্টুরেন্টে যাবে। সময় থাকলে একটা ভালো সিনেমায়। আধা-আধা প্রেমের আমেরিকান চিক ফ্লিক মেয়েরা নাকি দেখতে খুব পছন্দ করে। মেয়েটাকে তার এত ভালো লাগে—কোনোদিন কি মুখ ফুটে বলার সুযোগ হবে?

দুপুরবেলা লাঞ্চ সেরে রিয়াজ তার তৈরি-করা গ্রাফিক্স ইন্টারফেসের একটা অংশ পরীক্ষা করে দেখছে। জিনিসটা মোটামুটি ছাড়া হয়েছে তবে কোথাও একটা ধূর্ত 'বাগ' লুকিয়ে আছে। এমনিতে বোঝা যায় না, হঠাৎ

হঠাৎ দেখা দেয়। কীভাবে সেটা বের করতে পারবে সেটা নিয়ে চিন্তা করছিল, তখন ক্রিস্টিনা তার ঘরে উঁকি দিল— "রিয়াজ।"

রিয়াজের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল, "কী খবর ক্রিস্টিনা?"

"ভালো।"

"শুনে খুশি হলাম। অন্তত কোনো একজনের ভালো খবর রয়েছে।"

"কী হল? সমস্যা হচ্ছে নাকি?"

"এমনি সমস্যাকে আমার ভয় নেই। কিন্তু এই যে পিছলে ধরনের সমস্যা—এই আছে এই নেই—একেবারে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে!"

ক্রিস্টিনা রিয়াজের মনিটরের দিকে ঝুঁকে পড়ল। দুজনে খানিকক্ষণ সমস্যাটা নিয়ে কথাবার্তা বলে এবং একসময় ক্রিস্টিনা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "তোমার যন্ত্রণা তুমি সামলাও। আমি এর মাঝে নেই। এমনিতেই আমার নিজের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"সামনের সপ্তাহ থেকে ছুটি নিচ্ছি একমাসের জন্যে। যাবার আগে একশটা কাজ শেষ করে যেতে হবে।"

রিয়াজ অবাক হয়ে বলল, "একমাসের জন্যে ছুটি নিচ্ছ?"

"হ্যাঁ। অনেকদিন থেকে প্ল্যান করছিলাম। একটা আর. ভি. ভাড়া করে ক্রস কান্ট্রি পাড়ি দেব।"

"বাহ্! কী মজা! কোথায় যাবে?"

"ইয়েলোস্টোন হয়ে সাউথে। আরিজোনা-ইউটা। ন্যাশনাল পার্কগুলি দেখে আসব। চমৎকার হাইকিং ট্রেল আছে।"

"আর. ভি. গুলি তো বিশাল হয়—একেবারে বাসের মত। এতবড় আর.ভি. তুমি চালাতে পার?"

"না-পারার কী আছে! একটু চালালেই প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার সাথে জেফ থাকবে। জেফ আউটডোরের এক্সপার্ট।"

"জেফ?" হঠাৎ করে রিয়াজ কেমন জানি একটা ধাক্কা খেল। আর.ভি.-এর ছোট পরিসরে ক্রিস্টিনার সাথে একজন পুরুষমানুষ একমাস সময় কাটাবে ব্যাপারটা চিন্তা করেই হঠাৎ তার ভিতরে কী যেন জ্বালা করে ওঠে। ক্রিস্টিনার সাথে তার সম্পর্ক একেবারেই ভদ্রতার সম্পর্ক, তার ব্যক্তিগত জীবনে কে আসবে কে যাবে সেটি কোনোভাবেই তার মাথাব্যথার কারণ হওয়ার কথা নয়—কিন্তু তবুও তার ভেতরটা কেমন জানি তেতো হয়ে গেল।

"হ্যাঁ। জেফ।" ক্রিস্টিনা সহজ গলায় বলল, "তুমি দেখনি। ইনকাম ট্যাক্স এটর্নি।"

"ও।" রিয়াজ আর কী বলবে বুঝতে পারল না।

"তোমার যদি সিস্টেম লেভেলে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সামনের এক সপ্তাহের মাঝে আমাকে বলতে হবে।"

"তোমার না এর মাঝেই একশটা সমস্যা আছে?"

"একশটা আর একশ-একটার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।" ক্রিস্টিনা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে হাসল, রিয়াজ প্রত্যুত্তরে ক্রিস্টিনার দিকে সেভাবে হাসতে পারল না, হাসার ভঙ্গিটি হল কৃত্রিম এবং সূক্ষ্ম একধরনের জ্বালা ধরানো।

ক্রিস্টিনা চলে যাবার পর রিয়াজ বেশ খানিকক্ষণ মনিটরের সামনে চুপচাপ বসে রইল। জেফ নামক আউটডোর এক্সপার্ট একজন মানুষের সাথে ক্রিস্টিনা রিক্রিয়েশান ভেহিকল করে একমাসের জন্যে ক্যাম্পিং যাচ্ছে, সেটি তাকে এভাবে বিচলিত করছে দেখে রিয়াজ কেমন জানি নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেয়ে যায়। কেন জানি নিজেকে হঠাৎ ছোট এবং অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

ক্রিস্টিনা ছুটিতে যাবার আগের দিন হঠাৎ রিয়াজের কাছে একটা বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে এল। সবাই লাঞ্চে বসে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে তাকে বলল, "আমি তো একমাস থাকব না, তুমি এই একমাস আমার এপার্টমেন্টে থাকতে চাও?"

রিয়াজ চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে?"

"এপার্টমেন্ট তো এমনিতেই খালি পড়ে থাকবে। তুমি ইচ্ছে করলে থাকতে পার। আমার লিভিংরুমে একটা হাইড-এ-বেড আছে, তোমার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।"

রিয়াজ তার হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই বব চোখ মটকে বলল, "বেডরুম ছাড়া রাজি হয়ো না রিয়াজ।"

কথাটার একটা স্থূল ইঙ্গিত রয়েছে কিন্তু ক্রিস্টিনা সেটা গায়ে মাখল না। সপ্রতিভভাবে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহুঁ বেড রুম ছাড়তে পারব না। একজন মানুষের বেডরুম হচ্ছে তার সবকিছু।"

বব মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। বিয়ে করার সবচেয়ে বড় ত্যাগ হচ্ছে যে, বেডরুম তখন অন্য একজনের সাথে ভাগাভাগি করতে হয়।"

জিম হেসে বলল, "অন্য একজন কাকে বলছ ? তোমার বউ।"

"বউ হলেও সে অন্য একজন!"

ক্রিস্টিনা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "সিরিয়াসলি। তুমি ইচ্ছে করলে এই একমাস আমার এপার্টমেন্টে থাকতে পার।"

রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু তুমি আমাকে চেনোই না। আমি হয়তো তোমার বাসা জ্বালিয়ে দিলাম! হয়তো তোমার বাসা থেকে ড্রাগ বিক্রি করা শুরু করলাম। তোমার জিনিসপত্র গ্যারাজ সেলে বিক্রি করে দিলাম!"

ক্রিস্টিনা হেসে বলল, "সেই রিস্ক তো আছেই।"

"তাহলে ?"

"বেঁচে থাকলে একটু-আধটু রিস্ক নিতে হয়।

বব মুখ গম্ভীর করে বলল, "এটা একটু-আধটু হল ? রিয়াজ হয়তো তার ফান্ডামেন্টালিস্ট বন্ধুদের নিয়ে তার হেডকোয়ার্টার খুলে ফেলল। ফার্টিলাইজার দিয়ে এক্সপ্লোসিভ তৈরি করে ইউএন বিল্ডিং উড়িয়ে দিল!"

রিয়াজ মাথা নাড়ল, "না, সেই ভয় নাই। আমার কোনো ফান্ডামেন্টালিস্ট বন্ধু নাই। ফার্টিলাইজারে বড় দুর্গন্ধ, আমি সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে রাজি না।"

বব হা হা করে হেসে বলল, "আমি ন্যাচারাল ফার্টিলাইজারের কথা বলছি না।"

রিয়াজ ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি সত্যিই তোমার এপার্টমেন্টে আমাকে থাকতে বল ? আমি জানতাম মেয়েরা নিজেদের জায়গা নিয়ে খুব খুঁতখুঁতে হয়।"

"আমি নিজের জায়গা নিয়ে খুব খুঁতখুঁতে, সেইজন্যেই ববকে না বলে তোমাকে বলেছি!"

ক্রিস্টিনার কথায় বব অত্যন্ত আহত হবার ভঙ্গি করে বলল, "বেল্টের নিচে আঘাত করলে তুমি! একেবারে বেল্টের নিচে!"

রিয়াজ ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "তুমি আমাকে যেটুকু বিশ্বাস করছ, আমার বোন কিন্তু আমাকে সেটুকু বিশ্বাস করে না। তার ঘরে আমাকে জুতো খুলে ঢুকতে হয়। বিছানায় বসতে দেয় না।"

বব জানতে চাইল, "তার কারণ ?"

"তার কারণ আমি সত্যিকার অর্থে নোংরা মানুষ।"

"নোংরা মানুষ ?"

"হ্যাঁ। একটা শার্ট না ধুয়ে ছয়মাস পরতে পারি। বিছানার চাদর ছিঁড়ে না-যাওয়া পর্যন্ত বদলাই না। মোজা গেঞ্জি—"

"থাক, অনেক হয়েছে।" ক্রিস্টিনা থামিয়ে দিয়ে বলল, "সত্যিকারের নোংরা মানুষ দেখনি বলে এইভাবে বলছ। যারা সত্যিকারের নোংরা মানুষ, তারা নোংরামি নিয়ে গল্প করে না।"

"তারা কী করে ?"

"তারা কিছুই করে না। তারা জানেই না যে তারা নোংরা। তাদের কাছে সেটাই নরমাল।"

বব ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কবে থেকে নোংরামোর এক্সপার্ট হলে ?"

"কারণ আমি সত্যিকারের একজন নোংরা মানুষের সাথে তিন বছর ঘর-সংসার করেছি। আমি যদি তার নোংরামোর একটা-দুইটা গল্প বলি তাহলে তোমরা লাঞ্চ না-খেয়ে উঠে যাবে!"

বব মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমার শোনার খুব কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু মনে হয় আপাতত কৌতূহল সংবরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"অবশ্যই।" ক্রিস্টিনা আবার রিয়াজের দিকে তাকাল, "থাকবে ?"

"ঠিক আছে থাকব।"

"ভেরি গুড।"

"আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি আমার জন্যে কেন তোমার বাসাটা ছেড়ে দিচ্ছ। তোমার জায়গায় আমি হলে এটা করতাম বলে মনে হয় না।"

ক্রিস্টিনা নিজের লাঞ্চ খেতে খেতে বলল,"আমার একবারে কোনো উদ্দেশ্য নাই সেটা ঠিক নয়!"

রিয়াজ চোখ বড় বড় করে বলল, "উদ্দেশ্য আছে নাকি ?"

"আছে। তুমি এই একমাস কিটিকে দেখেশুনে রাখবে।"

"কিটি ? কিটি কে ?"

বব গম্ভীরমুখে বলল, "ক্রিস্টিনার পঙ্গু শাশুড়ি।"

"আহ্ বব! তুমি এ বাজে কথা বলতে পার!" ক্রিস্টিনা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিটি হচ্ছে আমার বিড়াল। অত্যন্ত লক্ষ্মী বিড়াল। তোমাকে কোনো জ্বালাতন করবে না।"

"বিড়াল হলে ঠিক আছে। কুকুরকে আমি খুব ভয় পাই।"

বব রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "আগেই রাজি হয়ো না। জিজ্ঞেস করে জেনে নাও পুরুষ না মহিলা বিড়াল।"

"কেন?"

"রোমান্টিক টাইপের হলে সব বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসবে।"

ক্রিস্টিনা মুখ টিপে হেসে বলল, "এটা এখন পুরুষও না, মহিলাও না। এটা নিউটার্ড!"

সবাই হা হা করে হেসে উঠল।

রিয়াজ তার ঢাউস গাড়িটা পার্কিংলটে বেশ কষ্ট করে পার্ক করল। চারিদিক ছিমছাম ছোট ছোট গাড়ি, তার মাঝে তার এই ঢাউস গাড়িটাকে কী বেখাপ্পা লাগছে! নিউইয়র্কের এক বন্ধুর কাছে থেকে গাড়িটাকে একমাসের জন্যে ধার নিয়েছে। এরকম কুৎসিত বলেই গাড়ি ধার পেয়েছে, ভালো গাড়ি কে আরেকজনের হাতে ছেড়ে দেবে? এদেশে গাড়ি দেখলেই ভিতরের মানুষটাকে কল্পনা করে নেয়া যায়। ছোটখাটো ছিমছাম গাড়িতে থাকবে শাদা আমেরিকান প্রফেশনাল, আর এই ধরনের ঢাউস পুরনো বড় গাড়িতে থাকবে হতদরিদ্র কালোমানুষেরা, চাকরিসন্ধানী হিস্পানিক ইমিগ্রেন্টস। রিয়াজ অবশ্যি মাথা ঘামাল না। হতদরিদ্র কালো মানুষেরা আর চাকরিসন্ধানী হিস্পানিক ইমিগ্রেন্টরা শেষ পর্যন্ত হতদরিদ্র আর চাকরিসন্ধানীই থেকে যায়—তার মতো মানুষেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা শাঁসালো ডিগ্রি নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে উপরে উঠে যায়।

ঠিকানা দেখে রিয়াজ ক্রিস্টিনার এপার্টমেন্ট খুঁজে বের করে কলিংবেলে চাপ দিতেই প্রায় সাথে সাথেই ক্রিস্টিনা দরজা খুলে দিল। রিয়াজকে দেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এস এস। ঘরের যা অবস্থা, ঢুকতে পারবে তো?"

ক্রিস্টিনা খাটো শর্টসের ওপর একটা টি-শার্ট পরে আছে। অফিসে সবসময় সে সুন্দর পোশাক পরে যায়, ঘরে এই সাধারণ পোশাকে তাকে দেখতে একজন অপরিচিতা মেয়ের মতো লাগছে। মেয়েটার শরীরটা সুন্দর, খাটো শর্টসে তার চমৎকার পায়ের পুরোটা দেখা যাচ্ছে। দেশে মেয়েদের পোশাক সবসময় তাদের পা পুরোপুরি ঢেকে রাখে, তাদের শরীরের এই সুন্দর অংশগুলি কেউ দেখতে পায় না। রিয়াজ কবিতা-টবিতা বিশেষ পড়েনি, তাহলে বলতে পারত বাংলাদেশের কবিরা মেয়েদের পায়ের সৌন্দর্যের ওপর কোনো কবিতা লিখেছে কি না।

"ঘরের অবস্থা খুব খারাপ। কাল ভোরে রওনা দেব, এখনো কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারিনি।

রিয়াজ তাকিয়ে দেখল ঘর ঝকঝক তকতক করছে। মেঝেতে একটা বড় ব্যাকপেক খোলা। তার ভিতরে এবং বাইরে কিছু জিনিসপত্র ছড়ানো, ক্রিস্টিনা সম্ভবত সেটাকেই লক্ষ্য করে অভিযোগ করছে। রিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি সত্যিই বলছ যে তোমার ঘর খুব অগোছালো নাকি এটা একধরনের বিনয়।"

ক্রিস্টিনা হেসে ফেলল, বলল, "আমার ঘরবাড়ি আরো পরিষ্কার থাকে।"

"তাহলে আমি তোমার এখানে থাকছি না।"

"কেন?"

"আমি তোমার ঘরবাড়ি এই পর্যায়ের পরিষ্কার রাখতে পারব না। তার চেষ্টা করতে থাকলে বেঁচে থাকার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে!"

"তোমার সিদ্ধান্ত নেবার সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন আর মত পাল্টাতে পারবে না। এস তোমাকে দেখিয়ে দিই। এই এইদিকে কিচেন, এই হচ্ছে হাফ বাথরুম, এই এখানে একটা ছোট স্টোর মতো রয়েছে—"

ক্রিস্টিনা রিয়াজকে তার এপার্টমেন্টে একটা ছোট ট্যুর দিয়ে দেয়। কোথায় কী আছে, কোনটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে বুঝিয়ে দেয়। ফ্রিজের উপর একটা ছোট নকশাদার ম্যাগনেট দিয়ে আটকানো একটা কাগজে কিছু টেলিফোন নম্বর লেখা আছে। জরুরি অবস্থায় যোগাযোগ করার জন্যে। রিয়াজ খানিকটা মুগ্ধ হয়ে ক্রিস্টিনার কাজকর্ম কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ করছিল, কী চমৎকারভাবে গুছিয়ে কথা বলছে, শুনলে মনে হবে সে বুঝি কয়েকদিন থেকে প্র্যাকটিস করছে কী বলবে! শুধু ক্রিস্টিনা নয়—আগেও লক্ষ করেছে আমেরিকানরা তুলনামূলকভাবে অনেক সুশৃঙ্খলভাবে থাকে, কথা বলে এবং কাজকর্ম করে।

ক্রিস্টিনার কথা বলা শেষ হবার আগেই রিয়াজ জিজ্ঞেস করল, "এখনো তো আসল জিনিসটাই দেখাওনি।"

"কী?"

"তোমার বিড়াল। কিটি। কোথায় সে?"

"ও, আচ্ছা।" ক্রিস্টিনা লিভিংরুমের একটা জানালা খুলে মাথা বের করে সুর করে ডাকল, "কিটি—কিটিকিটিকিটি।"

প্রায় সাথে সাথেই খোলা জানালা দিয়ে একেবারে সাধারণ দেশী একটা বেড়াল লাফিয়ে এসে ঢুকল। বিড়ালটা ক্রিস্টিনার পা ঘষে আদুরে গলায় একেবারে দেশী বিড়ালের মতো ম্যাঁও ম্যাঁও করতে শুরু করে। ছোটবাচ্চারা যেভাবে পুতুলকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে, ক্রিস্টিনা হুবহু সেভাবে বিড়ালটাকে তুলে বুকে চেপে ধরে বলল, "এই হচ্ছে কিটি।"

রিয়াজের মনে হতে থাকে, এই বুঝি বিড়ালটা থাবা থেকে নখ বের করে ক্রিস্টিনাকে আঁচড়ে দেবে কিন্তু সেরকম কিছু হল না। এই দেশের বেড়ালের মনে হয় ওরকম জাপটাজাপটি আদরে অভ্যাস আছে। আঁচড় না দিয়ে বরং ক্রিস্টিনার বুকে মুখ লুকিয়ে বিড়ালটা আদুরে গলায় একধরনের শব্দ করতে থাকে! ক্রিস্টিনা নরম গলায় বলল, "কিটি লক্ষ্মীটি। এই হচ্ছে রিয়াজ। তোমাকে একমাস দেখেশুনে রাখবে!"

রিয়াজের একেবারে স্পষ্ট মনে হল বিড়ালটা যেন তার কথা বুঝতে পেরে মাথা তুলে রিয়াজকে একনজর দেখে নিল!

"তুমি যেরকম চাপাচাপি করে আদর করছ, আমি কিন্তু সেভাবে আদর করতে পারব না।" রিয়াজ সাবধানে বিড়ালটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তুমি বরং যাওয়ার আগে একমাসের এডভান্স আদর করে দিয়ে যাও!"

"তার দরকার হবে না।" ক্রিস্টিনা বিড়ালটাকে নিচে নামিয়ে দিয়ে বলল, "কিটি খুব লক্ষ্মী বিড়াল।"

রিয়াজ ক্রিস্টিনার বাসায় আরো খানিকক্ষণ সময় কাটায়। ক্রিস্টিনা তাকে কফি-মেশিনে কফি তৈরি করে দেয়, সাথে ঘরে-তৈরি চিজ কেক। চিজ কেকটি খেতে এত মজা যে রিয়াজ লোভে পড়ে দুই টুকরা খেয়ে ফেলল। এই মেয়েটি সারাদিন অফিস করে কখন এইসব তৈরি করার সময় পায় কে জানে। চলে আসার সময় রিয়াজের হাতে এপার্টমেন্টের চাবি তুলে দিল, কাল ভোরে চলে যাবার পর সে যখন ইচ্ছে এসে উঠতে পারবে।

পরদিন বিকালে অফিস থেকে বের হয়ে রিয়াজ সরাসরি ক্রিস্টিনার এপার্টমেন্টে উঠে আসে। গাড়িতে তার ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র, বইখাতা নিয়ে এসেছে। কোনো জায়গায় থাকার জন্যে এমনিতে যা প্রয়োজন, বিছানা চাদর বালিশ কম্বল তোয়ালে টুথপেস্ট সাবান—ক্রিস্টিনা তার সব ব্যবস্থা করে গিয়েছে। এসব কাজ একজন বাঙালি মেয়ের থেকে মনে হয় একটি আমেরিকান মেয়ে অনেক সুন্দর করে করতে পারে।

চাবি খুলে ঘরে ঢুকেই রিয়াজের চোখ জুড়িয়ে গেল, পুরো ঘরটি একোবরে ছবির মত ঝক ঝক করছে। যাবার আগে নিজের বেডরুম থেকে টিভিটা বের করে দিয়ে গেছে, রিয়াজ যেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে টিভি দেখতে পারে! রিয়াজ ব্যাগ নামিয়ে রেখে কিচেনে ঢুকে থমকে দাঁড়াল, টেবিলের উপর একটি চিজকেক সাজানো। কাছে একটা সুন্দর খাম, খামের ওপর তার নাম লেখা। রিয়াজ খামটি খুলে একটা ছোটকাগজ বের করে আনে। কাগজে লেখা–

> ডিনারের সাথে খাওয়ার জন্যে একটা চিজকেক তৈরি করে গেলাম। যদি ভালো ছেলে হয়ে থাকো তাহলে এটা কেমন করে তৈরি করে সেটাও শিখিয়ে দেব!
>
> –ক্রিস্টিনা

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলল। একমাসের জন্যে ক্যাম্পিং যাচ্ছে, তার ব্যস্ততার মাঝেও ক্রিস্টিনা তার জন্যে একটা চিজকেক তৈরি করে গেছে। গতকাল সে যে এত শখ করে খেয়েছে ব্যাপারটা তার চোখ এড়ায়নি। মেয়েদের মাঝে মনে হয় সবসময় এই ব্যাপারগুলি থাকে। সে কি কখনো কারো জন্যে এরকম কিছু করবে ? খুব বেশি কিছু নয়, কিন্তু যেটুকু না করলেও ক্ষতি নেই, সেরকম কিছু ? মনে হয় না।

ক্রিস্টিনা মেয়েটি আউটডোর এক্সপার্ট একজন ইনকামট্যাক্স এটর্নির সাথে একমাসের জন্যে ক্যাম্পিং গিয়েছে, তারা এক টেন্টের নিচে এক স্লিপিং ব্যাগে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুমুবে—এই ব্যাপারটি যদি সে খুব ভালো করে না জানত, রিয়াজ হয়তো ভেবে বসত মেয়েটার হৃদয় তার জন্যে খানিকটা দ্রবীভূত হয়ে আছে।

রাত্রিবেলা লিভিং রুমের সোফাটি টেনে হাইড-এ-বেডটি বের করে রিয়াজ সেখানে বসে বসে অনেকদিন পর বাসায় চিঠি লিখল। বাবাকে লিখল ইংরেজিতে :

> প্রিয় বাবা,
> আমার সশ্রদ্ধ সালাম নেবেন। আপনি শুনে খুশি হবেন, এই সামারে আমি আই.টি.পি.-তে কাজ করছি। আই.টি.পি আমার ফিল্ডে সবচেয়ে বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি। আমি যার সাথে কাজ করছি তিনি এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত। সামারের শেষে যদি তার সাথে কিছু পাবলিকেশন্স দাঁড়া করাতে পারি সেটা ভবিষ্যতে খুব কাজে দেবে।

আমার মাস্টারস প্রায় শেষের পথে। সরাসরি পিএইচডি করব নাকি এক-দুই বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

আপনারা কেমন আছেন ? শরীরের যত্ন নেবেন। সেদিন নিউজউইকে একটা নিবন্ধে দেখেছি প্রতিদিন খানিকটা করে শারীরিক পরিশ্রম করা হলে আয়ু এবং জীবনের মান অনেক বেড়ে যায়। আপনার শারীরিক পরিশ্রম বলতে গেলে হয় না—নিয়ম করে হলেও ভোরবেলা মাইলখানেক হাঁটবেন।

আপনার স্নেহের
–রিয়াজ

মাকে লিখল বাংলায় :

মা,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরি করে ফেললাম। তোমার সাথে চিঠি লেখার কম্পিটিশনে আমি অবশ্যি কোনোদিন পারব না, তাই তার চেষ্টাও করি না। কাজকর্মের খুব চাপ থাকে তাই গুছিয়ে চিঠি লিখতেও পারি না।

তুমি জানতে চেয়েছ কবে দেশে আসব। এখন মাস্টার্সের শেষের দিকে আছি, দেশে এলে পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে। একধাক্কায় পুরোটা শেষ করে ফেলতে চাই। তাছাড়া প্লেনের ভাড়া সাংঘাতিক, সেটা জোগাড় করতেও কালো ঘাম ছুটে যাবে। এই সামারের কাজ শেষ হলে হাতে কিছু টাকা জমতে পারে, তখন আসব সামনের বছর।

ছোটচাচার বড়মেয়ের কথা লিখেছ—সেটা নিয়ে তুমি খামোখা মনখারাপ করো না। এখন সবাই বড় হয়েছে, নিজের মতো করে থাকবে—এতে তোমার মনখারাপ করা কী আছে ? ডাক্তার সাহেবের ছেলের কথা শুনে খুব অবাক হলাম। আমি এতদিন ছেলেটাকে ভালো বলেই জানতাম—তলে তলে এই অবস্থা কে জানত ? বুয়ার মেয়ের বিয়ে ভালোয় ভালোয় সমাধান হয়েছে শুনে খুশি হলাম। রিকশাআলা জামাইয়ের যদি এত দাবিদাওয়া থাকে, পাইলট জামাইদের দাবিদাওয়া কী হবে ?

তুমি শুনে খুশি হবে যে আমি মোটামুটি রান্না শিখে গেছি। এবারে দেশে এলে তোমার কাছ থেকে হাতে-কলমে কিছু ট্রেনিং নিয়ে নেব। চিজকেক বলে এক ধরনের কেক তৈরি হয়—তুমি সেটা তৈরি করতে জানো ?

সবাইকে নিয়ে ভাল থেকো।

তোমার রিয়াজ।

ছোট বোন শিউলিকে লিখল :

শিউলি,
আমি কোথেকে চিঠি লিখছি শুনলেই তোর সন্দেহবাগিশ মন ফুলটাইম কাজ শুরু করে দেবে! আমাদের অফিসে ক্রিস্টিনা নামে একটা মেয়ে কাজ করে (মেয়েটার চেহারা বে-ওয়াচের নায়িকাদের মতো!) মেয়েটা একমাসের জন্যে ক্যাম্পিং গিয়েছে—সেই একমাস আমি তার বাসায় আছি। মেয়েটার একটা বিড়াল রয়েছে, দেখতে শুনতে একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশের বিড়ালের মতো, কিন্তু সেটার ভাবভঙ্গি আচার-ব্যবহার একেবারে আমেরিকান স্টাইলের। সেটাকে বাংলায় ডাকাডাকি করলে কাছে আসে না, ইংরেজিতে ডাকতে হয়। এই দেশে-যে বিড়ালদের এত ধরনের খাবার আছে আমি জানতাম না। তুই কি জানিস বিড়ালকে পুষ্টিসম্মত খাবার না-খাওয়ালে সেটার শরীরে ভিটামিনের অভাব হতে পারে?
তোদের ইউনিভার্সিটির কী খবর? ক্লাস হয়, নাকি এক হরতালের পর আরেক হরতাল? যতদিন দেশে ছিলাম হরতাল জিনিসটাকে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাপার বলে মনে হত। এই দেশে এসে পুরো ব্যাপারটাকে একটা অবিশ্বাস্য পাগলামো মনে হয়।
যাই হোক, আমি এই ঠিকানায় একমাস আছি। অফিসের কাছে বাসা—মনে হচ্ছে সামনের এক মাস তুলনামূলকভাবে শান্তিতেই কাটিয়ে দেব।
ভালো থাকিস।

রিয়াজ।

রিয়াজ অবশ্যি তখনো জানত না পরবর্তী একমাস শান্তিতে কাটিয়ে দেয়া তার ভাগ্যে ছিল না।

॥ চার ॥

ক্রিস্টিনার বাসায় রিয়াজের এক সপ্তাহ কেটে গেল। এই দেশে ছাত্র হয়ে এসেছে, এই পর্যন্ত ছাত্রদের ডর্মিটরি কিংবা ছোট ঘিঞ্জি এপার্টমেন্টে কয়েকজন মিলে গাদাগাদি করে থেকে এসেছে। এই প্রথম সে একটা সত্যিকারের বাসায় থাকছে, খোলামেলা সুন্দর ঝকঝকে বাসা। আধুনিক জীবনের যতরকম বিলাসসামগ্রী থাকার কথা, এখানে সবই

আছে—বিড়ালের খাবার পর্যন্ত কৌটা করে আসে, সেই কৌটা খোলার যন্ত্র পর্যন্ত রয়েছে। রিয়াজের সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে কফি গুঁড়ো করার যন্ত্রটি। হাতের মুঠির মতো ছোট রি-ইনফোর্সড প্লাস্টিকের একটা কৌটা, ঢাকনা খুলে কফি বীন ঢেলে ঢাকনা বন্ধ করে সুইচ চেপে ধরতেই নিমিষে কফি গুঁড়ো হয়ে যায়। যারা কড়া কফি খেতে চায় তাদের জন্যে বেশি মিহি গুঁড়ো, যারা হালকা খেতে চায় তাদের জন্যে বড় বড় দানা।

ক্রিস্টিনার বিড়াল কিটি'র সাথে এখনো ভাব হয়নি, শুধুমাত্র পরিচয়টা হয়েছে। এমনিতে নিজে থেকে তার কাছে আসে না, শুধুমাত্র খাবারের কৌটা খোলার শব্দ পেলে যেখানেই থাকুক তার কাছে ছুটে আসে, লেজ তুলে একটু আহ্লাদি করারও চেষ্টা করে। বিড়ালটা ক্রিস্টিনার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে আছে। প্রতিদিন দরজা খুলে ঘরে ঢোকার সাথে সাথে একবার ছুটে এসে দেখে যায়, রিয়াজকে দেখে যে তার আশাভঙ্গ হয় সেটা গোপন রাখার চেষ্টা করে না। খানিকটা অভিযোগের সুরে মনে হয় একটু প্রতিবাদও জানায়। আজকেও দরজা খুলে ঘরে ঢোকার পর রিয়াজকে দেখে বিড়ালটা মনক্ষুণ্ন হয়ে নিচুস্বরে একটু অভিযোগ করল। রিয়াজ হাতের জিনিসপত্র টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, "বিড়াল মিয়া, আসল অবস্থা তো জানো না, তাই এত কমপ্লেন।"

বিড়ালটি বাংলা কথা শুনে অভ্যস্ত নয় তাই আবার একটু প্রতিবাদ করল। রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "জি না! আমি তোমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে পারব না, শুনতে ইচ্ছা না হলে তুমি শুনো না।"

রিয়াজ লক্ষ করে দেখেছে, বিড়ালটার সাথে কথা বললে প্রতিবারই উত্তরে সেটাও কিছু-একটা শব্দ করে, দেখে মনে হয় সত্যি যেন কথা বুঝতে পেরে একধরনের বাক্যালাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এবারেও ব্যতিক্রম হল না, একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বিড়ালটা ম্যাঁয়াও করে শব্দ করল। রিয়াজ বলল, "খিদে পেয়েছে নাকি ? একটু দাঁড়াও বাপু—সবসময় এতো খাই-খাই করো না।"

রিয়াজ বিড়ালের খাবারের কৌটা বের করে খুলে তাকে খেতে দিয়ে তার লিটার-বক্স পরিষ্কার করল। তারপর বাথরুমে ঢুকে দীর্ঘসময় নিয়ে গোসল করে বের হয়ে এল। রিয়াজ খুব গোছানো স্বভাবের নয়—জুতো খুলে এক জায়গায় রাখে, মোজা অন্য জায়গায়: প্যান্ট এক জায়গায় আন্ডারওয়ার গেঞ্জি আরেক জায়গায়। সে যেখানে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝে পুরো জায়গাটা জিনিসপত্র জামাকাপড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। ক্রিস্টিনা ফিরে আসার সপ্তাহখানেক আগে থেকে সে ঘরদোর পরিষ্কার করা শুরু করবে।

ফ্রিজে দুদিন আগের রান্না-করা খাবার ছিল। মাইক্রোওয়েভে গরম করে সে খেতে বসল। একা একা বসে খেতে নিজেকে কেমন জানি বোকা-বোকা মনে হয়, রিয়াজ তাই সবসময় অন্য একটা কিছু করতে করতে খায়। বেশিরভাগ দিনই সে খাবারপ্লেট হাতে নিয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে, আজ সে ক্রিস্টিনার মেলবক্স থেকে উদ্ধার-করা রাজ্যের কাগজপত্র নিয়ে বসল। এই দেশে কী পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাপা হয় সেটা অবিশ্বাস্য। একজন মানুষের মেলবক্সে যত চকমক রঙিন কাগজ জমা হয়, সে তার দশভাগের একভাগও খুলে দেখে না। তবুও প্রতিদিন এই পরিমাণ জাংক মেল কেন পাঠানো হয় কে জানে? ক্রিস্টিনার জাংক মেল শেষ করে রিয়াজ টেবিলের উপর থেকে শিউলির চিঠিটা বের করল। চিঠিটা সে এর মাঝে কয়েকবার পড়েছে এবং প্রত্যেকবারই কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে একটু বিষণ্ন অনুভব করেছে। চিঠির কোথাও মনখারাপ করা কোনো কথা লেখা নেই, কিন্তু তবুও পড়ে কেন জানি মন খারাপ হয়ে যায়। রিয়াজ আবার পুরো চিঠিটা পড়ল, খুব সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা চিঠি—কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি নেই ভাষার মারপ্যাঁচ নেই। মা'কে নিয়ে লিখেছে : 'যতদিন যাচ্ছে মা ততই যেন সাধুসন্ন্যাসীর মতো হয়ে যাচ্ছে, কোনো কিছুতেই রাগে না, দুঃখ পায় না, অবাক হয় না।' রিয়াজ বাক্যটা কয়েকবার পড়ল। কোথাও লেখা নেই কিন্তু পড়লেই মনে হয়, রাগ হবার দুঃখ পাবার কিংবা অবাক হবার মতো কিছু-একটা ঘটেছে বাসায়। ব্যাপারটা কী হতে পারে লিখেনি সেটাই হয়েছে সমস্যা—মনের ভিতরে কী যেন খচখচ করতে থাকে। বাবাকে নিয়ে লিখেছে : 'কয়দিন থেকে বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সেদিন ঠেলেঠুলে ডাক্তার চাচার কাছে পাঠানো হয়েছে, ডাক্তার চাচা পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বললেন—বাবার কিছুই হয়নি—যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে কিছু করার নেই! বাবা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন!' রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলল—বাবাকে কখনোই খুব কমবয়স্ক বলে মনে হয়নি, কিন্তু তাই বলে বুড়ো? শিউলি নিজের সম্পর্কে লিখেছে : 'আমি মনে হয় ভালোই আছি।' এটা কীরকম বাক্য? পড়লেই কেমন জানি একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। উনিশ বছরের একটা মেয়ের চিঠিতে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কেন থাকবে? রিয়াজ চিঠিটা ভাঁজ করে রাখল এবং ঠিক তখন কলিংবেলের শব্দ শুনতে পেল।

রিয়াজ কেমন জানি চমকে ওঠে, সে লুঙি পরে খালিগায়ে চেয়ারের ওপর পা তুলে হাত দিয়ে মাখিয়ে ভাত খাচ্ছে। দৃশ্যটার মাঝে কেমন জানি

একটা গ্রাম্য-গ্রাম্য ভাব রয়েছে—সে এই দৃশ্যটা কাউকে দেখাতে চায় না। হাত ধুয়ে সে শরীরে একটা টি-শার্ট গলিয়ে নিল। যেই এসে থাকুক সে তার কাছে আসেনি। কাজেই তাকে দরজা থেকেই বিদায় করে দেয়া যাবে। তবুও লুঙিটা পাল্টে একটা প্যান্ট পরে নেবে কিনা একটু চিন্তা করল, কিন্তু তখন আরো একবার অধৈর্য সুরে কলিংবেল বেজে ওঠায় সে সেভাবেই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দরজার সামনে ক্রিস্টিনা দাড়িয়ে আছে। ক্রিস্টিনাকে দেখে সে যেটুকু অবাক হল তার থেকে অনেক বেশি অবাক হল তার অবস্থা দেখে। বাম চোখটা প্রায় বুঁজে গেছে, চোখের নিচে গোল হয়ে রক্ত জমে আছে। ঠোঁটের কাছে কোথায় জানি কেটে গিয়ে লাল হয়ে আছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত, সমস্ত চেহারায় বড়ধরনের বিপর্যয়ের চিহ্ন। রিয়াজ খানিকক্ষণ হা করে তাকিয়ে বলল, "ক্রিস্টিনা! কী হয়েছে তোমার ?"

ক্রিস্টিনা কোনো কথা না বলে রিয়াজকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল। তার সাজানো-গোছানো এপার্টমেন্টটি যে এই কয়দিনে প্রায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সেটা সে লক্ষ করল বলে মনে হল না। হাতের ব্যাগটা মেঝে রেখে কেমন যেন টলতে টলতে এসে সোফায় বসে পড়ল। রিয়াজ আরো একপা এগিয়ে এসে বলল, "ক্রিস্টিনা।"

ক্রিস্টিনা দুই হাতে মাথা চেপে ধরে রেখে মাথা না তুলে বলল, "কী ?"

"কী হয়েছে তোমার ?"

"ওই-ওই—বাস্টার্ড জানোয়ার—"

কার কথা বলছে কী বলছে রিয়াজ কিছুই বুঝতে পারল না। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি ঠিক আছ ক্রিস্টিনা ?"

ক্রিস্টিনা মাথা নাড়ল, বলল, না এবং হঠাৎ টলে পড়ে গেল। রিয়াজ একেবারে প্রস্তুত ছিল না, তাই তাকে ধরতে পারল না, সে গড়িয়ে একেবারে নিচে পড়ে গেল। রিয়াজ নিচু হয়ে তাকে ধরতে গিয়ে চমকে ওঠে, সমস্ত শরীর আগুনের মতো গরম, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে দুইহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে সোফায় তোলার চেষ্টা করে, ক্রিস্টিনা হঠাৎ তার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে ছটফট করতে থাকে। রিয়াজ সেই অবস্থায় তাকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে বলল, "ক্রিস্টিনা! প্লিজ-প্লিজ—শান্ত হও। প্লিজ।"

ক্রিস্টিনা ছটফট করতে করতে বলল, "না-না—কিছুতেই না। না।"

রিয়াজ খানিকক্ষণ হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বুঝতে পারে সে একটা লুঙি পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া ঘরের

দরজা খোলা এবং এইমাত্র দুইজন কৌতূহলী-চোখে দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে সাবধানে হেঁটে গেছে। শুধুমাত্র এই দেশ বলে এখনো কেউ কী হয়েছে জানার জন্যে ভিতরে ঢুকে পড়েনি। রিয়াজ প্রথমে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় তারপর নিজের লুঙি পাল্টে একটা জিন্সের ট্রাউজার পরে আসে। ক্রিস্টিনা তখনো একধরনের অস্থিরতায় ছটফট করছে, রিয়াজ কাছে এগিয়ে গিয়ে নরম গলায় ডাকল, "ক্রিস্টিনা।"

ক্রিস্টিনা চোখ খুলে তাকাল, রিয়াজকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। রিয়াজ আরেকটু কাছে গিয়ে বলল, "তোমার অনেক জ্বর। তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই?"

ক্রিস্টিনা হঠাৎ উঠে বসে রিয়াজকে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল। রিয়াজ একেবারে হকচকিয়ে গেল, কী করবে বুঝতে না-পেরে সে একহাতে তাকে ধরে রেখে অন্যহাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "কী হয়েছে ক্রিস্টিনা তোমার? কেন কাঁদছ তুমি।"

"আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। একেবারে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

"কেন?"

"তুমি বল তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না। বল। বল।"

কথা দেয়ার জন্যে এটি অত্যন্ত কঠিন একটি প্রতিশ্রুতি কিন্তু রিয়াজ এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। বলল, "আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না।"

"আমি খুব একা। আমার কেউ নেই।"

রিয়াজ কোনো কথা বলল না। মনে মনে ভাবল, আমরা সবাই একা। আমাদের কারো কেউ নেই।

ক্রিস্টিনা মুখ তুলে রিয়াজের দিকে তাকাল তারপর আবার আকুল হয়ে কেঁদে উঠল।

"ক্রিস্টিনা। একটু শান্ত হও। তোমার খুব জ্বর। তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।"

"না, না—যেতে চাই না।"

"তাহলে অন্তত শুয়ে একটু বিশ্রাম নাও। তোমার জ্বরটা দেখি কত। একটা টাইলেনল বা এসপিরিন খাও।"

ক্রিস্টিনা হঠাৎ করে শান্ত মেয়ের মতো মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল। থার্মোমিটার খুঁজে এনে জ্বর মেপে দেখে প্রায় একশ চারের কাছাকাছি।

রিয়াজ তাকে শুইয়ে রেখে বাথরুমে আয়নার পিছনে ছোট মেডিসিন-কেবিনেট থেকে টাইলেনল খুঁজে এনে ক্রিস্টিনাকে খাইয়ে যখন উঠে যেতে চাইল, ক্রিস্টিনা তাকে যেতে দিল না, জ্বরতপ্ত হাতে রিয়াজের হাত ধরে রাখল। রিয়াজ ক্রিস্টিনার মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইল। সে তাকিয়ে দেখল পুরো ঘরটি এলোমেলো হয়ে আছে। এখান থেকে খাবারঘরটা দেখা যাচ্ছে, টেবিলে তার অর্ধভুক্ত খাবার। ঘরময় তার জামা কাপড় ছড়ানো, টেলিভিশনটি ঘরের মাঝামাঝি। টেলিভিশনের নিচে ক্রিস্টিনার না-পুরুষ না-মহিলা বিড়াল কিটি শঙ্কিত চোখে বসে রয়েছে।

রিয়াজ কেমন যেন অসহায় অনুভব করে। এই মেয়েটির কী হয়েছে জানে না, দেখে মনে হয় কেউ বুঝি মেরেছে, খুব নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে। মানুষটি নিশ্চয়ই জেফ! ক্রিস্টিনার একটি-দুটি কথা শুনে তাই মনে হল। যে মানুষটির সাথে একমাসের জন্যে বেড়াতে বের হয়েছে, সে কেন এরকম নিষ্ঠুরভাবে মারবে ? মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মনে হয় কখনোই বোঝা যাবে না।

মানব-চরিত্রের এই রহস্যময় রূপের বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে রিয়াজের একেবারে শাদামাটা দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথাও মনে পড়ল। সে একমাসের জন্যে ক্রিস্টিনার খালি বাসায় থাকতে এসেছে। এখন ক্রিস্টিনা ফিরে এসেছে, সে কোথায় যাবে ? বাসাটির যা একটা অবস্থা করে রেখেছে সেটাও বলার মতো নয়। জ্বরের ঘোর থেকে ক্রিস্টিনা জেগে ওঠার আগে তার কি ঘরটা পরিষ্কার করা উচিত নয় ?

রিয়াজ অবশ্যি কিছুই করল না। ক্রিস্টিনার জ্বরতপ্ত হাত ধরে রেখে সে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। নিজের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই, সবসময় সে ক্রিস্টিনার জন্যে প্রবল একধরনের আকর্ষণ অনুভব করে এসেছে। এখন এই নিশুতি রাতে অত্যন্ত দুঃখী একটা মেয়ের মাথার কাছে বসে সে তার জন্যে একধরনের গভীর মমতা অনুভব করে।

টেবিলে একটা বড় বাটিতে ফুটন্ত পানি, সেখনে একটা ছোট ওয়াশ-টাওয়েল ভিজিয়ে ক্রিস্টিনা খুব সাবধানে নিজের কাটা ঠোঁটে সেঁক দিচ্ছে। সামনে একটা আয়না এবং একটু পরে-পরে সেদিকে তাকিয়ে সে শিউরে উঠছে। কাছেই আরেকটা চেয়ারে রিয়াজ বসে খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা সমবেদনা এবং বেশ খানিকটা কৌতুক নিয়ে তাকে লক্ষ করছে। ক্রিস্টিনা আয়নাটা হাতে টেনে নিয়ে নিজের ফোলা চোখ, চোখের নিচে

জমে থাকা কালো রক্ত এবং কাটা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে প্রায় আর্তনাদের মতো শব্দ করে বলল, "দেখেছ ? দেখেছ বাস্টার্ডটা কী করেছে ? দেখেছ ?"

"দেখেছি।"

"আমি যদি—" ক্রিস্টিনা তারপর যে-বাক্যটি উচ্চারণ করল বাংলায় তার যথাযথ অনুবাদ করলে সেটি দাঁড়ায়, 'নিজ হাতে অণ্ডকোষ ছিঁড়ে না ফেলি'। একটি মেয়ের মুখে বাক্যটি শুনতে কেমন জানি অস্বস্তি বোধ হয়। রিয়াজ সেটা বুঝতে দিল না, সহজ ভঙ্গিতে বলল, "তাহলে তখন ছিঁড়লে না কেন ? এখন কেন বলছ ?"

"কারণ ঐ বাস্টার্ড, ঐ কুকুরীর বাচ্চার গায়ে জোর বেশি—তুমি কি ভেবেছ আমি চেষ্টা করিনি ?"

রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "আমি এখনো বুঝতে পারছি না—দুজন বয়স্ক মানুষ কীভাবে মারপিট করে ?"

ক্রিস্টিনা কোনো উত্তর না দিয়ে একটা ভয়ের ভাব নিয়ে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে কেউ তার এরকম অবস্থা করতে পারে। রিয়াজ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "কেন এভাবে খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখছ। দুদিন সময় দাও, ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক হবে না।"

"হবে। কাল রাতে তোমার বাম চোখটা পুরো বুজে ছিল, এখন অর্ধেকটা খুলে এসেছে।"

ক্রিস্টিনা হঠাৎ করে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "তুমি গতরাতে আমার জন্যে যা করেছ তার জন্যে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।"

"আমি কী করেছি ?"

"আমি জানি না। আমি একটা ঘোরের মাঝে ছিলাম। প্লেনে বসে ড্রিংক করে একেবারে পুরোপুরি আউট হয়েছিলাম। তার ওপর জ্বর। আমার এত খারাপ লাগছিল, নিজের ওপর এত ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল বেঁচে থেকে কী হবে ? তখন তুমি—"

"আমি ?"

"তুমি এত আদর করে আমাকে সান্ত্বনা দিলে যে আমার মনে সব দুঃখ কেটে গেল। একধরনের শান্তি হল।" ক্রিস্টিনা হঠাৎ চোখ বড় বড় করে বলল "আমি কি তোমাকে চুমু টুমু খেয়েছিলাম ?"

"না। খাওনি। তোমার কাটা ঠোঁট ঠিক হওয়ার আগে চুমু খাওয়া মনে হয় ঠিক হবে না।"

ক্রিস্টিনা আবার দুশ্চিন্তিত মুখে আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী মনে হয় তোমার ? মুখে কি দাগ থেকে যাবে ?"

"আমি জানি না। একবার ডাক্তারের কাছে গেলে—"

"না।" ক্রিস্টিনা মাথা নেড়ে বলল, "ডাক্তার যদি জিজ্ঞেস করে কেমন করে কেটেছে, কী বলব ?"

"সত্যি কথা বলবে।"

"উঁহুঁ। লজ্জা করবে। পুরুষমানুষ শুধুমাত্র গায়ের জোর বেশি বলে মেয়েমানুষকে পিটাচ্ছে এটা খুব লজ্জার ব্যাপার। তুমি তো পুরুষমানুষ, তুমি এটা বুঝবে না।"

রিয়াজ আসলেই বুঝল না, তবে কথাটার মাঝে যে খানিকটা জ্বালা এবং অনেকখানি শ্লেষ রয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। একটু অপরাধী-অপরাধী সুরে বলল, "আমি খুব দুঃখিত ক্রিস্টিনা।"

"যাই হোক—" ক্রিস্টিনা আবার হালকা গলায় বলল, "আমি আর কী কী করেছিলাম ?"

"আমার ঘাড়ে মাথা রেখে ভেউভেউ করে কেঁদেছ। সারারাত আমার হাত ধরে রেখেছ!"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

"কী লজ্জার কথা!"

"লজ্জার কী আছে। তোমার জন্যে আমার খুব মায়া হচ্ছিল।"

ক্রিস্টিনা গরম পানিতে ওয়াশ-টাওয়েল ভিজিয়ে নিজের চোখের উপর চেপে ধরে বলল, "আমার আবছা-আবছা ভাবে মনে পড়ে যখন আমি ঘরে ঢুকেছি তখন তুমি এটা স্কার্ট পরে আছ। চেক-চেক একটা স্কার্ট।"

"লুঙি। ঐটা স্কার্ট না, ঐটার নাম লুঙি।"

"আমি ঘোরের মাঝে ছিলাম, তার মাঝে মনে হচ্ছিল রিয়াজ কেন মেয়েদের একটা স্কার্ট পরে আছে ?"

রিয়াজ একটু গলা উঁচিয়ে বলল, "এটা মেয়েদের স্কার্ট না। বাংলাদেশে এটা পুরুষের পোশাক।"

"ও।" ক্রিস্টিনা তার কথা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না।

"তোমার বাসা যে লণ্ডভণ্ড করে রেখেছি সেটা চোখে পড়েনি ?"

"রাতে চোখে পড়েনি। সকালে চোখে পড়েছে।"

"তোমার একমাস পরে আসার কথা ছিল, ফিরে এসেছ এক সপ্তাহ পরে।"

"আমি দুঃখিত।"

"তুমি ঠিক সময় এলে আমি ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে ফেলতাম।"

ক্রিস্টিনা না-বাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। রিয়াজ ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বলতে চাইছ?"

"আমি বলতে চাইছি যে তুমি পারতে না। তুমি ভাবতে যে তুমি পরিষ্কার করেছ, কিন্তু সেটা সত্যিকার পরিষ্কার না।"

রিয়াজ অপরাধীর মতো মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ।"

ক্রিস্টিনা হেসে বলল, "তোমার মনখারাপ করার কিছু নেই। তুমি আসলে সত্যিকারের নোংরা মানুষ দেখনি, তাই মনখারাপ করছ।"

"তুমি দেখেছ?"

"হ্যাঁ আমার প্রাক্তন হাজব্যান্ড।"

"ও।" রিয়াজ জিজ্ঞেস করবে কি করবে না ঠিক বুঝতে পারছিল না, শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "কোথায় আছে তোমার প্রাক্তন হাজব্যান্ড।"

"জানি না। সানফ্রান্সিসকো নাহয় লস এঞ্জেলস। যদি এর মাঝে মারা গিয়ে না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই জেলে আছে।"

রিয়াজ ঠিক বুঝতে পারছিল না ক্রিস্টিনা কি সত্যিই বলছে নাকি ঠাট্টা করছে। একটু অবাক হয়ে বলল, "জেলে?"

"মনে হয়। মাইক ছিল আমার হাইস্কুলের সুইট হার্ট। আমি কখনো তো ফ্যামিলি পাইনি তাই খুব শখ ছিল ফ্যামিলির। প্রথম যে মানুষটা একটু হেসে হেসে কথা বলেছে তাকেই বিয়ে করে ফেলেছি। আমি তখন টিন-এজার, মাইকও টিন-এজার। দুজনে মিলে কী দুর্দশা।" ক্রিস্টিনা তার অতীত দিনের কথা স্মরণ করে একবার হালকাভাবে শিউরে উঠল।

"মাইক খুব নোংরা ছিল?"

"হ্যাঁ। মনে কর তার সর্দি হয়েছে, বিছানায় শুয়ে চাদর টেনে সেটাতে নাক ঝেড়ে ফেলত। বাসায় একবার ছোট ছোট ইঁদুর হয়েছে, সেই ইঁদুরকে হাত দিয়ে ধরে—"

"হাত দিয়ে ধরে?"

"চাপ দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দিত।"

রিয়াজ কেমন জানি শিউরে উঠল। ক্রিস্টিনা মোটামুটি অবিচল গলায় বলল, "এক-দুই মাস দাঁত ব্রাশ না করে কাটিয়ে দিত। লোকটার দুর্গন্ধের কোনো সেন্স ছিল না। জামাকাপড় যে ধুতে হয় জানত না। মাসের পর মাস গোসল করত না। টয়লেট পেপার বলে যে একটা জিনিস আছে সেটাও জানত বলে মনে হয় না। একবার হয়েছে কী, বাইরে বারবি কিউ করছি। হঠাৎ একটা পাখি—"

"পাখি ?"

ক্রিস্টিনা হঠাৎ মাথা নেড়ে বলল, "থাক। বলে কাজ নেই। তুমি রাতে ডিনার করতে পারবে না।"

"ঠিকই বলেছ।"

ক্রিস্টিনা আয়নায় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, "তুমি অফিসে যাবে না ?"

"যাব। একটু দেরি হলে ক্ষতি হবে না।"

"তা ঠিক। অফিসে কাউকে আমার কথা কিন্তু বলো না।"

"বলব না।"

"থ্যাংক ইউ। আমি বাসা থেকেই বের হব না। কেউ যেন আমাকে দেখতে না পারে।"

রিয়াজ নরম গলায় বলল, "এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন ?"

"না নিচ্ছি না।" ক্রিস্টিনা রিয়াজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "থ্যাংক ইউ রিয়াজ।"

"ইউ আর ওয়েলকাম। কিন্তু কেন ?"

"সবকিছুর জন্যে।"

হঠাৎ ক্রিস্টিনা তার চেয়ার থেকে উঠে রিয়াজের কাছে গিয়ে তাকে একটা চুমু খেল। কেউ কাউকে চুমু দিলে প্রত্যুত্তরে তাকেও চুমু দিতে হয়। রিয়াজ মাথা ঘুরিয়ে ক্রিস্টিনার গালে একটি চুমু দিতে গেল, ক্রিস্টিনা তখন তার ঠোঁট এগিয়ে দেয়। রিয়াজ থেমে গিয়ে বলল, "তোমার ঠোঁট কেটে আছে। ব্যথা করবে।"

"করুক।"

চুমু দিতে গিয়ে রিয়াজ প্রথমে লিপস্টিক এবং একটু পরে রক্তের স্বাদ অনুভব করে।

॥ পাঁচ ॥

ক্রিস্টিনা বেশ খোলামেলাভাবেই রিয়াজকে তার এপার্টমেন্টে একমাস থেকে যাবার আমন্ত্রণ জানালো কিন্তু রিয়াজ রাজি হল না—সে নিউইয়র্কে তার আগের আস্তানায় ফিরে গেল। তবে মাঝেমাঝেই কাজকর্মে রাত হয়ে গেলে সে ক্রিস্টিনার বাসায় রাত কাটিয়ে যেত। দুজনের সম্পর্কটি বেশ বিচিত্র, বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে যেন একজায়গায় স্থির হয়ে গেছে—ঘনিষ্ঠতার একটা পর্যায় এসে থেমে গেছে। যেন একটা অদৃশ্য দেয়ালের দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে আছে, তারা সেই দেয়াল অতিক্রম করবে না। কেউ চেষ্টা করলে হয়তো সেই দেয়াল ভেঙে যাবে কিন্তু দুজনের কেউই চেষ্টা করবে না। জীবনের বড় ব্যাপার নিয়ে কেউই কোনো দায়বদ্ধতায় পড়তে চায় না। দুজনের মাঝে সহজ কার্যকর একটি সম্পর্ক, এর বেশি কিছু নয়। সেই সম্পর্কে মাঝে মাঝে চিড় খায়, মাঝে মাঝে ফাটল ধরতে চায়, আবার নিজে থেকে সেই ফাটল বুজে আসে। আই.পি.টি-তে দেখতে দেখতে সামার শেষ হয়ে আসছে, এখন যেরকম দুজনের প্রতিদিন দেখা হয়, আর কয়েক সপ্তাহ পরে আর সেভাবে দেখা হবে না—সেটা নিয়েই দুজনের মাঝে কথা হচ্ছে। কমবয়সীদের কাছে জনপ্রিয় একটা রেস্টুরেন্টে বসে দুজন খেতে-খেতে কথা বলছে। রিয়াজ সত্যিকারের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তোমাকে মিস করব, ক্রিস্টিনা।"

ক্রিস্টিনা চোখ মটকে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি।" রিয়াজ ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি করবে না?"

"করব। আমিও করব।"

"কতখানি করবে?"

ক্রিস্টিনা হেসে বলল, "ওহ! তুমি দেখি টিন-এজারদের মতো শুরু করলে।"

"আমার সেরকমই লাগছে।"

ক্রিস্টিনা মাথা এগিয়ে বলল, "তাহলে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করছ না কেন?"

রিয়াজ ক্রিস্টিনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "প্রস্তাব করলে তুমি যদি রাজি হতে তাহলে আমি হয়তো করেই ফেলতাম।"

"করেই দেখ না।"

"উঁহুঁ।"

"কেন?"

"আজকাল তো মেয়েরাও বিয়ের প্রস্তাব দেয়। নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। তুমিও তো দিতে পার।"

ক্রিস্টিনা মুখে হাসি টেনে এনে বলল, "তুমি তো কখনো বিয়ে করনি—আমি করেছি। আমি জানি বিয়ের আইডিয়াটা আসলে কাজ করে না।"

"কাজ করে না?"

"না। দুইজন সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন মানুষ একজন আরেকজনের কাছাকাছি কয়েক ফুটের মাঝে চব্বিশ ঘণ্টা থাকে, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। দুজনের মাঝে একজন যদি বড়রকম স্যাক্রিফাইস না করে, বিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব ব্যাপার।"

রিয়াজ সকৌতুকে ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রিস্টিনা গলায় জোর দিয়ে বলল, "আমি একটা সত্যিকারের বিয়ে করেছি, অনেকগুলি লিভ টুগেদার করেছি। আমি দেখেছি একজন পুরুষমানুষ যখন বুঝতে পারে মেয়েটা তার ওপর নির্ভর করছে, সাথে সাথে সে মনে করে সে তার পুরোটা কিনে নিয়েছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। শুধু শরীরটা—"

রিয়াজ বাধা দিয়ে বলল, "তুমি পুরুষদের নিয়ে খুব কঠিন কঠিন কথা বলছ। পৃথিবীতে অনেক হৃদয়বান পুরুষ আছে।"

"ছাই আছে।"

"আমাকে কি তোমার স্টিরিও টাইপড পুরুষের মতো মনে হয়?"

ক্রিস্টিনা খানিকক্ষণ রিয়াজের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এখন মনে হয় না। কারণ এখন তুমি তোমার সবচেয়ে ভালো অংশটা আমাকে দেখাচ্ছ, আমি আমার ভালোটা তোমাকে দেখাচ্ছি। তোমাকে বিয়ে করলে তুমি তোমার ভালো অংশটা দেখানো বন্ধ করে দেবে, আমিও আমার ভালো অংশটা বন্ধ করে দেব। দুজনেরই আসল রূপটা বের হয়ে আসবে। তখন আমি বলব রিয়াজ ব্যাটা এতবড় ধড়িবাজ, আর তুমি বলবে ক্রিস্টিনা বেটি এতবড় শয়তান—ব্যাস দুজনের সাথে দুজনের লেগে যাবে।"

ক্রিস্টিনার কথার ভঙ্গি শুনে রিয়াজ হো হো করে হেসে উঠল। ক্রিস্টিনা বলল, "আমি কোনো হাসির কথা বলছি না। আমি সত্যিকথা বলছি।"

রিয়াজ একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে তুমি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ না?"

ক্রিস্টিনা কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ রিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ একটু গম্ভীর হয়ে আসে এবং তাকে হঠাৎ একজন অপরিচিত মানুষের মতো দেখাতে থাকে। ক্রিস্টিনা একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "না, তোমাকে আমি প্রস্তাব দিচ্ছি না। তবে—"

"তবে ?"

"তোমাকে আমি অন্য একটা প্রস্তাব দিতে পারি।"

রিয়াজ হঠাৎ কেন জানি বিপন্ন অনুভব করে, সে দুর্বল গলায় বলল, "কী প্রস্তাব ?"

"আমি সবসময় একটা ফ্যামিলি চেয়েছিলাম। পাইনি। তুমি যদি রাজি থাকো—" ক্রিস্টিনা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে তুমি কি আমার একটা সন্তানের বাবা হবে ?"

কথাটির অর্থ বুঝতে রিয়াজের কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল। সে অবাক হয়ে বলল, "তুমি কী বললে ?"

"বলেছি যে আমি একটা বাচ্চা চাই। আমার নিজের বাচ্চা। তুমি কি তার বাবা হবে ?"

"বাবা ?"

"হ্যাঁ। তোমার কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না। বাচ্চাটাকে আমি বড় করব, মানুষ করব। তুমি যদি না চাও তাহলে তাকে কোনোদিন বলব না কে তার বাবা। তুমি শুধু আমাকে তেইশটি ক্রমোজম দেবে।"

"তেইশটি ক্রমোজম ? আমি ?"

"হ্যাঁ। তোমাকে যেটুকু দেখেছি মনে হয়েছে বেশ ভালোমানুষ—আমি চাই আমার সন্তানের বাবা হোক একজন ভালোমানুষ।

রিয়াজ চোখ বড় বড় করে ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে রইল। এখনো সে তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। ক্রিস্টিনা মুখে একধরনের করুণ আবেদনের ভঙ্গি করে বলল, "রাজি ?"

রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "এটা তুমি কী বলছ ?"

রিয়াজের কথায় ক্রিস্টিনার আশাভঙ্গ হল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে বলল, "তুমি তাহলে রাজি নও।"

"না। ক্রিস্টিনা—তুমি বুঝতে পারছ না এটা একটি অন্যায় অনুরোধ। এই অনুরোধে রাজি হওয়া যায় না।"

"কেন ?"

"আমি যদি একটি বাচ্চার জন্ম দিতে চাই তাহলে তার দায়িত্বটাও নিতে চাই। আমার সন্তানকে আমি দেখব না শুনব না, সেটা তো হতে পারে না। আমি তো স্পার্ম ব্যাংক না।"

ক্রিস্টিনা মিনতি করে বলল, "প্লিজ।"

"এটা হয় না ক্রিস্টিনা।"

"কেন হয় না? আমি—আমি তোমার একটা সন্তান চাইছিলাম।"

"কেন? আমার কেন?"

"কারণ—কারণ—তোমাকে আমার খুব পছন্দ রিয়াজ।"

রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে হাত বাড়িয়ে ক্রিস্টিনার হাত ধরে বলল, "আমাকে মাফ কর ক্রিস্টিনা। এটা হয় না।"

ক্রিস্টিনা দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে শেষপর্যন্ত রিয়াজের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি আমার অনুরোধে রাগ করলে না তো?"

"না না, রাগ করিনি।"

"আমরা এখনো আগের মতো ভালো বন্ধু আছি?"

"আছি।" রিয়াজ মাথা নেড়ে বলল, "একশবার আছি।"

কিন্তু সে বুঝতে পারল কোথায় জানি সুর কেটে গেছে। হঠাৎ করে তার নিজেকে কেন জানি প্রতারিত মনে হতে থাকে। এই প্রথমবার ক্রিস্টিনাকে নিয়ে সে কেমন জানি সূক্ষ্ম একধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করতে থাকে।

সামারের শেষে রিয়াজ আই.টি.পি-তে তার কাজ শেষ করে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ফিরে এল। বাইরে কাজ করে গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং অর্থ উপার্জনের সুযোগ হবে বলে যে-ধারণা করেছিল তার দুটিই আপাতত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে গবেষণা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং তার কাজটি কোনো গবেষণা না হয়ে রুটিন-কাজ হিসেবে শেষ হয়েছে। অর্থোপার্জনের ব্যাপারটিও সেরকম—যেটুকু অর্থ উপার্জন করেছে তার প্রায় পুরোটাই খরচ হয়ে গেছে। এর পেছনে ক্রিস্টিনার খানিকটা অবদান আছে, সত্যিকার আমেরিকানদের মতো থাকতে হলে কীভাবে দুই হাতে খরচ করতে হয় সেটা সে রিয়াজকে শিখিয়ে দিয়েছে।

নিউইয়র্কে ফিরে যাবার শেষসপ্তাহে সবাই রিয়াজকে নিয়ে একটি পিতজা পার্লারে গেল। কাউকে বিদায় দিতে হলেই তারা এখানে হাজির হয় কারণ এখানে হৈ চৈ এবং চেঁচামেচি করার সুযোগ রয়েছে। যেটুকু খাওয়া

যথেষ্ট সবাই মিলে তার থেকে কয়েকগুণ বেশি পিতজা খেয়ে ফেলল। এরকম অনুষ্ঠানের শেষে সাধারণত সবাই বিদায়ী অতিথিকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথাবার্তা বলে, আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না। বব মোটামুটি একটা দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে ফেলল। তার বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খাবারে মাছ বেশি থাকায় সেখানকার জনগোষ্ঠীর মস্তিষ্কে নিউরন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কীভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে তাদের একটা বাড়তি এবং অন্যায় সুযোগের সৃষ্টি হয় সেই তত্ত্ব! জিম অল্প দুয়েকটি কথায় তার বক্তব্য শেষ করে দিল, ডিগ্রি শেষ করার পর রিয়াজ চাইলেই এখানে পাকাপাকিভাবে যোগ দিতে পারে সেটা তাকে জানিয়ে দিল। অন্যান্য সবাই রিয়াজের আনন্দময় ভবিষ্যৎ কামনা করল। ক্রিস্টিনা কী বলে সেটা নিয়ে অনেকেরই একটু কৌতূহল ছিল, এই দুজনের সম্পর্ক-যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ছাড়িয়ে আরও বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে সেটা সবাই জানত। ক্রিস্টিনা বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, "তোমরা সবাই রিয়াজকে যেটুকু মিস করবে আমি তার থেকে বেশি মিস করব, কারণ সে এই কয়দিনেই আমার একজন খুব ভালো বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমার নিজস্ব একটা দুঃসময়ে সে আমাকে খুব সাহায্য করেছে। আমাদের সবার জীবন নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবে কিন্তু আমি আশা করব আমাদের বন্ধুত্বটি যেন দীর্ঘদিন টিকে থাকে।"

ক্রিস্টিনার কথা শুনে রিয়াজ মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবার পর রিয়াজ আবার তার কাজে ডুবে যায়। তার প্রফেসর হঠাৎ করে সাবাটিকেলে এক বছরের জন্যে ক্যামব্রিজ চলে গেছেন, এখন কোনো সমস্যা হলে কথা বলার কেউ নেই! কতদিনে গবেষণা শেষ করে কতদিনে থিসিস লেখা শুরু করবে মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে। উইক-এন্ড এলে মাঝেমাঝেই তার মন উদাস হয়ে যায়, ক্রিস্টিনার কথা মনে পড়ে। কোনো এক উইক-এন্ডে হঠাৎ করে নিউজার্সি হাজির হবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

এরকম সময়ে হঠাৎ করে রিয়াজের ছকবাঁধা জীবনের সবকিছু একেবারে পুরোপুরি ওলটপালট হয়ে গেল। ব্যাপারটি শুরু হল এভাবে:

রাত দেড়টা পর্যন্ত একটা বিদঘুটে সমস্যা নিয়ে ধস্তাধস্তি করে রিয়াজ শুতে গিয়েছে। চোখে মাত্র ঘুম নেমে এসেছে, হঠাৎ করে টেলিফোন বেজে

উঠল। এরকম অসময়ে টেলিফোন আসার এটিমাত্র অর্থ—এটি দেশ থেকে এসেছে। টেলিফোনের শব্দটি কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে সবসময়েই একটা দুঃসংবাদের শুরু বলে মনে হয়। রিয়াজ প্রায় লাফিয়ে উঠে রিসিভার ধরে বলল, "হ্যালো।"

"কে, রিয়াজ?"

অপর পাশ থেকে বাংলায় কথা বলছে, গলার স্বরটি তার ছোটবোন শিউলির সেটা বুঝতে রিয়াজের এক মুহূর্ত সময় লাগল।

"কী খবর, শিউলি?"

শিউলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। এই দীর্ঘ দূরত্বে কথা বললে মাঝেমাঝেই কথা যেতে-আসতে সময় লেগে যায়, কাজেই শিউলি কি আসলেই চুপ করে আছে নাকি এটি টেলিফোন-যোগাযোগের বিরতি, রিয়াজ বুঝতে পারল না। রিয়াজ আবার বলল, "কী খবর? সবাই ভাল?"

"তুই আমার চিঠি পাসনি?"

রিয়াজ একটু অবাক হয়ে বলল, "কোন্ চিঠি?"

শিউলি আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, রিয়াজ একটু শঙ্কিত হয়ে বলল, "কিসের চিঠি?"

"আমি তোকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম তুই এতদিনে পেয়ে গেছিস।"

"না, পাইনি। কেন? কী হয়েছে?"

"রিয়াজ। একটা ব্যাপার ঘটেছে।"

রিয়াজ ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী ব্যাপার?"

"তুই দেশে আয়।"

"দেশে আসব? কেন?"

"বাবা মারা যাচ্ছে।"

"কী বললি?" রিয়াজ চিৎকার করে বলল, "কী বললি তুই?"

"বলেছি বাবা মারা যাচ্ছে। লাংস ক্যান্সার। একেবারে লাস্ট স্টেজে।"

"লাংস ক্যান্সার? লা-লা—" রিয়াজ হঠাৎ করে কথা শেষ করতে পারল না।

"তোকে ঘুম থেকে তুলে এভাবে বলতে খুব খারাপ লাগছে কিন্তু আর সময় নাই। তুই যদি তাড়াতাড়ি না আসিস দেখতে পাবি না।"

"কী বলছিস তুই?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে আগে জানালি না কেন?"

"সময় ছিল না। যখন কনফার্ম হয়েছে তখন সময় শেষ।"

"বাবা কী বলেন?"

"বাবা?"

"হ্যাঁ।"

শিউলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুই আয় তারপর শুনবি।"

রিয়াজ মাথা নেড়ে বলে, "কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমরাও বুঝতে পারছি না। আর শোন—"

"কী?"

"তুই যদি আমার চিঠিটা পাস তাহলে সেটা খুলিস না।"

"খুলব না?"

"না।"

"কেন?:"

"এখানে আয় তাহলে বুঝবি। আমি রেখে দিই, অনেক টাকা বিল উঠে যাবে।"

"তুই রাখ। আমি ফোন করছি।"

"দরকার নেই। তুই চলে আয়—" বলে হঠাৎ শিউলি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

"কাঁদছিস কেন? বাবার তো এখনো—"

"আমি বাবার জন্যে কাঁদছি না।"

"তাহলে?"

"তুই চলে আয় প্লিজ।"

শিউলি টেলিফোনটা রেখে দিল। রিয়াজ পাথরের মতো বসে থাকে রাত দেড়টা পর্যন্ত যে বিদঘুটে সমস্যাটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করেছে, সেটা কীভাবে করতে হবে হঠাৎ করে সে ধরতে পেরেছে। সে সমস্যাটার কথা ভাবছে না কিন্তু তবু তার সমাধানটা মাথায় কেন এল?

রিয়াজ আবিষ্কার করল সে পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছে না, ঘুরেফিরে শুধু সমাধানটা মাথায় চলে আসছে।

একদিনের নোটিশে ঢাকা যাওয়া খুব সহজ নয়। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটি অসম্ভবও নয়। নিউইয়র্কে একজন করিতকর্মা বাঙালি ট্রাভেল এজেন্ট তাকে টিকেট জোগাড় করে দিল, ডিপার্টমেন্টের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তাকে সাহায্য করল আরেকজন, টুকিটাকি কেনাকাটায় সাহায্য করল তার রুমমেট। সন্ধেবেলা জেএফকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গেল একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। বিদায় নেবার সময় পকেটে হাত দিয়ে সে একটা চিঠি বের করে দেয়, ডিপার্টমেন্ট হয়ে আসার সময় তার মেলবক্স থেকে তুলে এনেছে। খামটা দেখে রিয়াজ একটু চমকে ওঠে শিউলির হাতে-লেখা চিঠি। খামটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বুকপকেটে রেখে দিলেও সে একমুহূর্তের জন্যে ভুলল না যে চিঠিটাতে ভয়ংকর কিছু আছে। এই চিঠিটা শিউলি লিখে ফেলেছে সত্যি কিন্তু তার পড়া নিষেধ, কারণ এখানে যা লেখা আছে শিউলি সেটা তাকে সামনাসামনি বলতে চায়। কী লেখা আছে রিয়াজ জানে না। কিন্তু সেটি তার বাবার লাংস ক্যান্সার হয়ে মারা যাওয়া থেকেও দুঃখের। কৌতূহল নয়, রিয়াজ একধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকে।

বাংলাদেশ বিমানের কাউন্টারে যারা আছে তারা বাংলাদেশের নয়, কিন্তু তাদের কাজকর্মে বাংলাদেশের সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের উপযোগী একধরনের ঢিলেমি রয়েছে। প্রতিমুহূর্তে রিয়াজের মনে হতে থাকে তাদের কোনো একজন তার কাছে ঘুস চেয়ে বসবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না, লাগেজ বুক করে বোর্ডিংকার্ড নিয়ে সে বোর্ডিং লাউঞ্জে ঢুকে গেল। প্লেনে কোথাও যাওয়ার সময় সে এই সময় থেকে তার যাত্রা উপভোগ করার চেষ্টা করে, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার—আগামী চব্বিশ ঘণ্টার যাত্রায় উপভোগ করার কোনো ব্যাপার নেই। তার ভিতরে বিচিত্র একধরনের অস্থিরতা এবং অসহায় একধরনের আতঙ্ক আনাগোনা করতে থাকে। কোথাও সে স্থির হয়ে বসতে পারে না, বোর্ডিং লাউঞ্জের ভিড়ের মাঝে সে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করতে থাকে।

প্লেনে ওঠার আধা-ঘণ্টা আগে সে হঠাৎ ক্রিস্টিনাকে ফোন করল। এরকম সময়ে তাকে বাসায় পাওয়ার কথা নয় কিন্তু তবু পেয়ে গেল। রিয়াজের গলার স্বর শুনে ক্রিস্টিনা খুশি হয়ে বলল, "কী খবর রিয়াজ, তোমার কোনো পাত্তা নেই।"

"আমি একটু ঝামেলায় আছি।"

"ঝামেলা তো থাকবেই—তাই বলে একটু যোগাযোগ রাখবে না?"

"আমার ঝামেলাটা একটু বেশি। আমি এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করছি। বাংলাদেশ যাচ্ছি।"

ক্রিস্টিনা হঠাৎ চুপ করে গেল, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "খারাপ খবর?"

"হ্যাঁ।"

"কত খারাপ?"

"অনেক। বাবার লাংস ক্যান্সার, মারা যাচ্ছেন।" কথাটা বলতে গিয়ে রিয়াজ হঠাৎ শিউরে ওঠে, কী অবলীলায় মারা যাচ্ছেন কথাটি উচ্চারণ করল!

ক্রিস্টিনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি খুব দুঃখিত রিয়াজ। খুব দুঃখিত—"

"ক্রিস্টিনা।"

"বল।"

"অন্য একটা ব্যাপারও ঘটেছে।"

"কী ব্যাপার?"

রিয়াজ শিউলির টেলিফোন এবং চিঠির কথা খুলে বলল। সবকিছু শুনে ক্রিস্টিনা অবাক হয়ে বলল, "তোমার কাছে এখন সেই চিঠিটা আছে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি এখনো খুলে পড়নি?"

"না।"

"পড়বে না?"

"ভয় করছে।"

ক্রিস্টিনা নরম গলায় বলল, "আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। আমি খুব দুঃখিত যে তুমি এই অবস্থায় পড়েছ।"

"ক্রিস্টিনা—"

"বল।"

"আমি কি চিঠিটা পড়ব?"

ক্রিস্টিনা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এটা তো আগে হোক পরে হোক তোমাকে জানতেই হবে।"

"আমি জানতে চাই না।"

"আমি দুঃখিত রিয়াজ।"

"আমি পড়ব না। সাহস পাচ্ছি না।"

ক্রিস্টিনা চুপ করে রইল, রিয়াজ বলল, "গুড বাই ক্রিস্টিনা।"

"গুড বাই। ভালোয় ভালোয় ফিরে আস।"

প্লেন যখন আটলান্টিকের উপর, প্যাসেঞ্জারদের প্রায় সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছে তখন রিয়াজ খুব সাবধানে খামটা খুলে চিঠিটা বের করে আনল। ভেতরে গোটা গোটা হাতে শিউলির লেখা দুই পৃষ্ঠার চিঠি।

রিয়াজ

তোকে কীভাবে লিখব বুঝতে পারছি না। বাবার লাংস-ক্যান্সার হয়েছে, ভেতরে সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, ডাক্তার বলেছে কোনো আশা নেই। প্রথমে ব্রঙ্কাইটিস, পরে নিমোনিয়া ভেবে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। নিশ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে অপারেশন করতে গিয়ে দেখে ভিতরে ক্যান্সার ছড়িয়ে গেছে।

বাবাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। অক্সিজেন এবং মর্ফিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। সবসময় পারা যায় না, মানুষের যন্ত্রণা কী ভয়ানক হতে পারে বাবাকে দেখলে বোঝা যায়। তুই বিশ্বাস করবি না—আমরা সবাই এখন অপেক্ষা করছি বাবার মৃত্যুর জন্যে। কী তাড়াতাড়ি পুরো ব্যাপারটা ঘটল বিশ্বাস হয় না। এখনো মনে হয় একটা ঘোরের মাঝে আছি।

রিয়াজ, তোকে দুইটা খবর দেব বলে এই চিঠি লিখছি—বাবার খবরটা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে ভাল খবর। এখন অন্য খবর দিই।

কীভাবে লিখব বুঝতে পাছি না। এর আগে কয়েকটা কাগজ নষ্ট করেছি। তোর জন্যে খুব কষ্ট লাগছে—তোকে কীভাবে খবরটা দিই।

তোর মা—(আমারও মা কিন্তু তোর সত্যিকারের মা) সেভেন্টি ওয়ানে মারা গেছেন বলে জানতাম। বাবা যখন বুঝল আর বাঁচবেন না তখন হঠাৎ করে কেমন যেন ভেঙে পড়লেন। একদিন আমার হাত ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তোর মা আসলে মারা যায়নি। পাকিস্তানি মিলিটারি ধরে নিয়ে রেপ করেছিল। যুদ্ধের পর মা যখন ছাড়া পেয়ে বাসায় এলেন, বাবা তাকে ঘরে নিলেন না। শেষপর্যন্ত একটা নওরেজিয়ান সংগঠন তোর মাকে নিয়ে চলে যায়। তোর বয়স তখন তিন। মা এখন কোথায় আছে কেউ জানে না।

ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার ভিতরে সবকিছু কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। বাবা মানুষটার জন্যে একই সাথে কেমন যেন ঘৃণা আর মায়া হচ্ছে। খুব কষ্টে আছি। আমার এই চিঠি পড়ে তুই কী করবি আমি জানি না। আমার নিজেকে একটা পিশাচী-পিশাচী বলে মনে হচ্ছে। কেমন করে তোকে আমি এটা লিখলাম?

তোর জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কী করি বলতে পারবি ? তোকে ধরে যদি চিৎকার করে কাঁদতে পারতাম মনে হয় ভাল লাগত। এই চিঠি পেয়েই তুই চলে আসিস। এখন আমাদের খুব দুঃখের সময়।

—শিউলি

রিয়াজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চিঠির দিকে তাকিয়ে রইল। বহুদিন আগের একটা দৃশ্য তার মনে পড়েছে। সে চিৎকার করে কাঁদছে, তাকে একজন শক্ত করে ধরে রেখেছে আর তার মা স্থিরচোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চলে যাচ্ছেন। কী ভয়ানক স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি।

রিয়াজ হঠাৎ শিউরে উঠল। তার হঠাৎ কাঁদতে ইচ্ছে করল, কিন্তু তার পাশে বসে একজন সিনেমা দেখতে দেখতে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। এখন সে কাঁদতে পারবে না। তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কী বলে কাঁদবে সে জানে। সে বলবে—মা। মাগো।

॥ ছয় ॥

এয়ারপোর্টে শিউলি অপেক্ষা করছিল, রিয়াজকে দেখে কাছে এগিয়ে এল। রিয়াজের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই চিঠিটা পড়ে ফেলেছিস ?"

রিয়াজ মাথা নাড়ল। তখন শিউলি এসে রিয়াজকে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল। রিয়াজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "কাঁদছিস কেন গাধার মতো।"

"জানি না।"

"লোকজন দেখছে।"

"দেখুক।"

"মা কোথায় ?"

শিউলি একটু চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "বাসায়।"

"কী করছে ?"

"কিছু না।"

"বাবা কেমন আছে।"

"আগের মতো।"

"ও।"

রিয়াজ এরপর বলার মত কিছু পেল না। এয়ারপোর্ট থেকে বাসা পর্যন্ত আসতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, মহাখালীর সামনে একবার, আর মিরপুর রোডে আরেকবার ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে গিয়েছিল। সে যাবার পর গত দুই বছরে ঢাকার ট্রাফিক আরো অনেক বেশি খারাপ হয়েছে। মানুষের হাতে নিশ্চয়ই কাঁচা পয়সা, না হলে এত গাড়ি এল কোত্থেকে?

বাসায় মা অপেক্ষা করছিলেন, রিয়াজকে দেখে কাছে এগিয়ে এলেন, "আসতে কোনো অসুবিধে হয় নাই?"

"না।" রিয়াজ কয়েক মুহূর্ত মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ মা। বাবা কোথায়?"

"শোয়ার ঘরে।"

"চল, দেখি গিয়ে।"

"হাতমুখ ধুয়ে নে। কিছু খাবি?"

"উঁহুঁ। আগে বাবাকে দেখে আসি।"

ঘরের দরজা খলে ভিতরে ঢুকে রিয়াজ শিউরে ওঠে, বিছানায় লম্বা হয়ে যে শুয়ে আছে সেটি তার বাবা? শীর্ণ মানুষটিকে দেখে তার মিউজিয়ামে রাখা ফারাওদের মমির কথা মনে হয়—হাড়ের ওপর কোনোমতে এক-পরদা চামড়া বিছিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হয় শরীরের ভেতর মাংসাশী কীট পুরো দেহটুকু কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে। মাথার চুল নোংরা পাটের মতো শাদা, গায়ের রং বিবর্ণ হলুদ। সমস্ত শরীর শুকিয়ে দাঁত এবং চোয়ালটুকু ঠেলে উঁচু হয়ে বের হয়ে এসেছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখে একধরনের ভীত অসহায় দৃষ্টি। ধীরে ধীরে বুক ওঠানামা করছে, নিশ্বাসের সাথে সাথে ঠোঁট নড়ছে, দেখে মনে হয় নিঃশব্দে ঈশ্বরের নাম জপ করছেন। রিয়াজের ভেতরে করুণা নয়, কেমন যেন ঘৃণার উদ্রেক হল। সে কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, ভালো আছ?"

কথাটি বলেই বুঝতে পারল এটি অত্যন্ত নির্বোধের মতো একটি উক্তি করা হয়ে গেছে। যে-মানুষের এরকম রূপ সে আর যাই থাকুক ভালো থাকতে পারে না। বাবা বললেন, 'না। খুব কষ্ট।'

রিয়াজ বাবার চোখের দিকে তাকাল, মানুষটির পুরো দেহ মৃতমানুষের মতো শীর্ণ নির্জীব এবং প্রাণহীন, শুধুমাত্র চোখগুলি জ্বলজ্বলে সজীব। বাবা সেই জ্বলজ্বলে চোখে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং সেই চোখের দিকে তাকিয়ে রিয়াজের ভিতরে হঠাৎ এক ভয়ংকর ক্রোধ ফুলেফেঁপে ওঠে। এই মানুষটি একদিন তার ধর্ষিতা দুঃখী মাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। যখন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার প্রয়োজন ছিল তখন সবচেয়ে বেশি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। যখন সবচেয়ে বেশি মমতার প্রয়োজন ছিল তখন সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। রিয়াজের হঠাৎ ইচ্ছে করল প্রচণ্ড হিংস্র আঘাতে তার বাবার কুৎসিত শীর্ণ দুর্বল নির্জীব যন্ত্রণাকাতর মুখটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিন্তু সে কিছুই করল না, বাবার পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল তার বাবার চোখে শুধু যন্ত্রণা নয় সেখানে অসহায় আতঙ্ক। রিয়াজ ফিসফিস করে বলল, "তুমি কেমন করে পারলে, বাবা ?"

বাবার ঠোঁট নড়ে ওঠে, চোখের কোণে পানি জমে ওঠে, বিড়বিড় করে কিছু একটা বলেন। অস্পষ্ট জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরে শুধুমাত্র 'নাসরিন' শব্দটা ধরতে পারে। নাসরিন তার মায়ের নাম—এই নামটি এই বাসায় দুই যুগ উচ্চারিত হয়নি।

রিয়াজ উঠে এল। সে অনেক কষ্ট করে নিজেকে সংবরণ করে হেঁটে যেতে থাকে। বাথরুমের ভিতরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপর হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শিউলি আর তার মা শুনতে পায় রিয়াজ ভাঙা গলায় ডাকছে—"মা! মা গো!"

গভীর রাতে নিঃশব্দে রিয়াজ তার বাবার ঘরে ঢুকল। মা বাবার মাথার কাছে বসে আছেন। ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যান রয়েছে, মা তবু হাতপাখা দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে বাতাস করছেন। মা চোখ তুলে রিয়াজের দিকে তাকালেন—"কী হল ? এত রাতে।"

"ঘুম আসছে না। জেট লেগ।"

"আয় বস।"

"বাবার কী অবস্থা ?"

"আগের মতো।"

"বাবা কি কথা বলতে পারবে ?"

"পারবে।"

"মা, আমি বাবার সাথে একটু কথা বলি ?"

মা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, "বল।"

"বাবার কি কষ্ট হবে ?"

"হবে। কষ্ট হবে। কিন্তু তোর সাথে কথা না বললে আরো বেশি কষ্ট হবে।"

মা উঠে দাঁড়ালেন, বাবাকে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "ওগো, একটু ওঠো।"

বাবা সাথে সাথে চোখ খুলে তাকালেন। মা বললেন, "রিয়াজ তোমার সাথে একটু কথা বলবে।"

"কোথায় ?"

রিয়াজ এগিয়ে এসে বলল, "এই-যে বাবা, আমি।"

"আয়। কাছে আয়।" বাবা শীর্ণ হাতে রিয়াজের হাত আঁকড়ে ধরলেন। তার চোখ পানিতে ভিজে উঠল। "ভুল করেছিলাম বাবা। খুব বড় ভুল করেছিলাম। মানুষ ছিলাম না তখন, দানব হয়ে গিয়েছিলাম।"

"কী হয়েছিল বলবে বাবা ?"

"শুনতে চাস না বাবা, শুনতে চাস না।"

"আমি শুনতে চাই বাবা। আমার শুনতে হবে।"

"বড় কষ্ট। বড় বেশি কষ্ট।"

"তবু তোমাকে বলতে হবে। বল বাবা।"

বাবা দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে কথা বলতে শুরু করলেন, রিয়াজ বাবার হাত ধরে শক্ত হয়ে বসে রইল। মা রিয়াজকে গভীর ভালোবাসায় ধরে রাখলেন, যেন এক মায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতার গ্লানি অন্য মায়ের ভালোবাসা দিয়ে মুছে দেওয়া যাবে।

এর দুদিন পর বাবা মারা গেলেন। জানাজায় অনেক মানুষ এসেছে, কমবয়সী একজন মৌলানা জানাজা পড়াবেন, রিয়াজকে ডেকে বলল, "আপনি মুর্দার ওয়ারিশান ?"

কথাটার অর্থ না-বুঝেই সে মাথা নাড়ল।

"আপনাকে সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হবে আপনার বাবার কোনো ঋণ থাকলে, দাবি থাকলে এখন বলতে হবে। নাহয় মাপ করতে দিতে হবে।"

"কেমন করে বলব ?"

"বলবেন আমি অমুক, মরহুম অমুকের পুত্র। আপনাদের কারো কাছে আমার পিতা কোনো কিছু ঋণ নিয়ে থাকলে আমাকে জানান আমি পরিশোধ করে দেব। যদি কোনোকিছু নিয়ে দাবি থাকে তাহলে সেই দাবি তুলে নিয়ে মুর্দাকে মাপ করে দেন।"

রিয়াজ মাথা নাড়ল, বলল, "না আমি পারব না।"

কমবয়সী মৌলানা অবাক হয়ে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "পারবেন না?"

"না।"

"কিন্তু আপনি মুর্দার ছেলে। আপনাকে বলতে হবে।"

"আপনি বলে দেন।"

জানাজায় দাঁড়িয়ে রিয়াজ শুনতে পেল কমবয়সী মৌলানা সবাইকে বলছে—কারো যদি তার মৃত বাবার প্রতি কোনো দাবি থেকে থাকে তাহলে যেন সেই দাবি তুলে নেয়। রিয়াজের মায়ের কথা মনে পড়ল, স্থিরচোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দূরে চলে যাচ্ছেন। তার মা আজ এখানে থাকলে কী করতেন? সব দাবি তুলে নিতেন? কোথায় আছে এখন তার মা? কোথাও আছেন কি?

ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। খাবার টেবিলের মাঝখানে একটা বড় মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির নরম আলো ঘিরে কয়েকটা পোকা ঘুরছে। যে-কোনো মুহূর্তে আগুনের শিখায় পুড়ে যাবে। পোকাগুলি কি জানে? হয়তো জানে না। হয়তো জানে কিন্তু সেটা নিয়ে কিছু করতে পারে না। ধরে নিয়েছে সেটাই নিয়তি।

"রিয়াজ।"

রিয়াজ মায়ের দিকে তাকাল, "কী মা।"

"তুই আরো কয়টা দিন থেকে যেতে পারবি না?"

"উঁহুঁ। তাড়াহুড়ো করে এসেছি, অনেক কাজ পড়ে আছে।"

মা একটা নিশ্বাস ফেললেন, বললেন, "এত কম সময়ের জন্যে আসিস যে বুঝতেই পারি না। আর এবার যে ঝামেলার মাঝে দিয়ে গেলি—"

"মা।"

রিয়াজের গলার স্বর শুনে মা একটু অবাক হয়ে রিয়াজের দিকে তাকালেন— "কী রে?"

"তুমি—তুমি—আমার মায়ের কথা কখন জেনেছ!"

মা রিয়াজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মোমবাতির আলোতে অন্ধকার দূর হয়নি, আবছা হয়েছে মাত্র, সেই আবছা অন্ধকারে চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না, মুখের ভঙ্গি মনের ভাব অনুমান করা যায় না। মা একটু চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "বিয়ের আগে।"

রিয়াজ সোজা হয়ে বসে বলল, "তুমি বিয়ের আগেই জানতে বাবা তার ওয়াইফকে নেয়নি?"

"জানতাম।"

"জানতে তার ওয়াইফের কোনো দোষ নেই? জানতে পাকিস্তানি মিলিটারি ধরে নিয়ে গেছে?"

"জানতাম।"

"সেই মানুষকে তুমি বিয়ে করতে রাজি হলে?"

মাকে কেমন জানি বিপন্ন দেখাল, মাথা নিচু করে বললেন, "রিয়াজ, কখনো কোনো মানুষকে বিচার করবি না। একজন মানুষের ভিতরে কী আছে তুই জানিস না। তোর বাবা মানুষটা খারাপ ছিল না।"

"ঠিক আছে। কিন্তু বিয়ের আগে তো জানতে না। জানতে?"

মা কোনো কথা বললেন না। রিয়াজ মাথা এগিয়ে বলল, "তুমি কেন এরকম মানুষকে বিয়ে করতে রাজী হলে?"

শিউলি বলল, "রিয়াজ, বোকার মতো কথা বলবি না। আমাদের দেশের মেয়েদের কথা তুই জানিস না? সবাই কি তোর ক্রিস্টিনা?"

"ক্রিস্টিনা?" মা অবাক হয়ে বললেন, "ক্রিস্টিনা কে?"

"কেউ না।"

শিউলি বলল, "তুই জানিস না, একাত্তরে নানাকে মেরে ফেলেছিল? মা শহীদ পরিবারের মেয়ে—কোনো যাওয়ার জায়গা নেই?"

রিয়াজ আঙুল দিয়ে টেবিলে শব্দ করতে করতে বলল, "মা।"

"কী?"

"তোমার যখন বিয়ে হল, এসে আমাকে দেখলে, তোমার কেমন লাগল?"

"কেমন আবার লাগবে?"

"সত্যি করে বল মা।"

"রিয়াজ, দ্যাখ আমি তোদের মতো এত পড়াশুনা করি নাই। তোদের মত আমার এত বিদ্যাবুদ্ধি নাই।"

"এর মাঝে বিদ্যাবুদ্ধির কী আছে?"

"তোকে দেখার আগে আমার মনে হয়েছিল আমি তোকে সহ্য করতে পারব না। তোর উপর রাগ উঠত আর তোর মা—"

"আমার মা—?"

"আর তোর মাকে ঘেন্না হত।"

"ঘেন্না ?"

"হ্যাঁ। তারপর বিয়ের সপ্তাহখানেক পর একদিন তোকে নিয়ে এল। আমি দেখি এইটুকুন একটা অবুঝ বাচ্চা—সারা দুনিয়ায় তার কেউ নাই। বাচ্চাটা কাঁদতেও জানে না। এদিকে-ওদিকে তাকায় আর কাকে যেন খুঁজে। আমি ভাবলাম— হায় আল্লাহ, এটা তো দেখি মাসুম বাচ্চা!"

"তখন আমাকে সহ্য করতে পারলে ?"

"পারলাম। কিন্তু তুই বড় জ্বালিয়েছিস ছেলেবেলায়। মা নেই বলে বেশি আশকারা দিয়েছিলাম।"

"মাকে এখনো ঘেন্না কর ?"

মা আহত-চোখে রিয়াজের দিকে তাকালেন, বললেন, "ছিঃ ! কী বলিস। যেদিন থেকে তুই আমাকে 'মা' ডাকা শুরু করেছিস, সেদিন থেকে আমি প্রতিরাতে হাত তুলে খোদার কাছে তোর মায়ের জন্যে দোয়া করেছি। নামাজ পড়ে আমি যখন দোয়া করি—আমি বলি, খোদা তুমি রিয়াজের মাকে শান্তি দাও। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক যেন শান্তিতে থাকে। তার উপরে যে অবিচার হয়েছে সেই অবিচারের সমান সুখ দাও।" মায়ের গলা হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল, সেভাবেই বললেন, "তোর বাবা এখন মারা গেছে। তোর বাবার রুহের মাগফেরাত চাইবার আগে আমি এখনও তোর মায়ের জন্যে দোয়া করি।"

মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। শিউলি কঠোর-চোখে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল, "রিয়াজ। তুই সাংঘাতিক নিষ্ঠুর।"

মা আঁচল থেকে মুখ তুলে বললেন, "শিউলি এভাবে কথা বলিস না তো।"

"কীভাবে।"

"রিয়াজ তোর বড়। নাম ধরে ডাকিস না। বড় খারাপ লাগে শুনতে। আর কীরকম ছোটলোকের মতো তুই-তোকারি করিস ?"

শিউলি চোখ কপালে তুলে বলল, "এখন ? এখন আমি রিয়াজকে 'ভাইয়া' বলে ডাকব ? আপনি বলে কথা বলব ? একেবারে দেখি বাংলা সিনেমা! মা, তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।"

রিয়াজ হো হো করে হেসে উঠল, বলল, "আসলেই মা। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"তোরা থাকিস তোদের বিদেশী নিয়ম কানুনে–"

"এটা বিদেশী নয়ম কানুন না মা। বিদেশে আপনি তুমি তুই নাই। এটা দেশী নিয়ম।"

"বুঝি না বাবা কিছু–"

"মা।"

"কী হল।"

"তোমাকে একবার আমেরিকা নিয়ে যাব।"

"আমাকে ?" মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, রিয়াজের বাবা মাঝে মাঝে দুজন মিলে ছেলের কাছে যাবার পরিকল্পনা করতেন, কিন্তু এখন সেটা তার বলার ইচ্ছা করল না।

"যাবে ?"

"না বাবা, ভয় করে।"

"ভয়ের কিছু নাই।"

শিউলি আদুরে গলায় বলল, "আমাকে নিবি না ?"

"তোকে ? তোকে ভিসা দেবে না। বুড়াবুড়ি না হলে আমেরিকা ভিসা দেয় না।"

"যদি দেয় ?"

"যদি দেয় তাহলে ঠিক আছে ।"

ঠিক কখন কীভাবে তারা বেড়াতে যাবে, কোথায় কী করবে, কী খাবে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করতে থাকে। তাদের দেখলে মনে হতে থাকে এই জীবনে বুঝি কোনো জটিলতা নেই। কোনো দুঃখ ক্ষোভ হতাশা যন্ত্রণা নেই।

কে জানে এটাই হয়তো জীবন।

॥ সাত ॥

মগবাজার এলাকার পাওয়ার সাপ্লাইয়ে বোমা ফাটার পর এই এলাকাটিকে নিরুপদ্রব করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন পাকিস্তান আর্মির সপ্তম আর্টিলারি বাহিনীর মেজর শাফকাৎ। একাত্তর সালের আগস্ট মাসের উনিশ তারিখ থেকে এই এলাকার বাসাগুলি একটি একটি করে সার্চ করা শুরু হয়।

রিয়াজদের বাসায় যখন মেজর শাফকাৎ তার ছোট দলটি নিয়ে পৌঁছেছেন তখন রাত নয়টা। রিয়াজের বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। দলটি বাসার ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখল, বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা রিয়াজকে দেখে মেজর শাফকাৎ একটু গাল টিপে আদর করে দিলেন। সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে দলটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু রান্নাঘরে রিয়াজের মাকে দেখে মেজর সাহেব মত পাল্টালেন। রিয়াজের মায়ের বয়স তখন তেইশ, তিনি সুন্দরী এবং যে কোনো হিসেবে একজন আকর্ষণীয়া মহিলা।

তিন বছরের রিয়াজকে ঘুম থেকে না তুলে সাবধানে তার বাবার কোলে দিয়ে বসার ঘরে আটকে রাখা হল। শোবার ঘরের বিছানাটিতে তিনি রিয়াজের মাকে ধর্ষণ করলেন। মেজর শাফকাৎ উদার ধরনের মানুষ, তার দলের সাধারণ সুবেদার হাবিলদার বা জোয়ানদের জন্যেও অল্পবিস্তর মমতা রয়েছে। তিনি প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে জিপে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, সাথে যারা আছে তারাও যেন এই 'খুপসুরৎ বাঙাল আওরাৎ'কে দিয়ে খানিকটা স্ফুর্তি করে আসতে পারে। মেজর শাফকাৎ অবশ্যি বেশি সময় থাকতে পারলেন না, তার কাছে অন্য জায়গায় যাওয়ার নির্দেশ এল। তাই যারা-যারা তখনো স্ফুর্তি করতে পারেনি তারা এই 'খুপসুরৎ বাঙাল আওরাৎ'কে সাথে নিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মেজর সাহেব ব্যাপারটিকে দেখেও না-দেখার ভান করলেন। যুদ্ধ অনেক বড় জিনিস, এখানে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না।

ডিসেম্বরের ষোল তারিখ বিকালবেলা জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করল, সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বাসা থেকে প্রায় সত্তরজন নানা বয়সী মেয়েকে উদ্ধার করা হয়। শাড়ি পেঁচিয়ে তাদের অনেকে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল বলে তাদেরকে শাড়ি পরতে দেয়া হত না। তাদের বেশিরভাগই ছিল বিবস্ত্র এবং যারা বেশিদিন থেকে আছে তারা সবাই তখন অন্তঃসত্ত্বা।

এই মেয়েগুলিকে উদ্ধার করার পর তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। রিয়াজের মাকে তার বাসায় নিয়ে আসেন একটি মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রের ডিরেক্টর এবং একজন ভারতীয় মেজর। রিয়াজের মা তখন তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা। রিয়াজের বাবা প্রথমে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে রাজি হলেন না। শেষপর্যন্ত যখন দেখা করলেন তখন কথাবার্তা হল খুব কম। রিয়াজের বাবা বললেন, "নাসরিন, তোমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে।"

রিয়াজের মা বললেন, "হ্যাঁ। আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছে।"

রিয়াজের বাবা বললেন, "ও।"

"এখন কী হবে?"

"জানি না।"

"দেশ স্বাধীন হয়েছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই না?"

রিয়াজের বাবা মেঝেতে থুতু ফেলে বললেন, "স্বাধীনতা না কাঁচকলা।"

"রিয়াজ কেমন আছে।"

"ভালো।"

"কোথায় আছে?"

"আছে ভিতরে। তার ফুপুর কাছে।"

"আমি দেখব।"

"না নাসরিন। দেখা ঠিক হবে না। ছোট মানুষ কিছু বুঝে না।"

"আমি দেখব।"

"নাসরিন, তুমি পাগলামি করো না। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর। তুমি জানো তুমি এইখানে থাকতে পারবে না।"

রিয়াজের মা তখন কাঁদতে আরম্ভ করলেন। রিয়াজের বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "কেন কাঁদছ? আহ্, এখানে কাঁদার কী আছে?"

"আমার কী হবে?"

"তোমাকে বিদেশে নিয়ে যাবে। আমি খোঁজ নিয়েছি একটা নরওয়ের অর্গানাইজেশন আছে। খুব ভালো নেটওয়ার্ক। সবার ব্যবস্থা করে দিবে। তোমারও ব্যবস্থা হবে।"

"আমি যেতে চাই না। আমি এখানে থাকতে চাই।"

"আহ্! কী বল এসব। এইটা হয় নাকি। সবাই জানে—জানাজানি হয়ে গেছে।"

রিয়াজের মা তখন চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখ কেমন জানি পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। শক্ত মুখ করে বললেন, "আমি রিয়াজকে একবার দেখব।"

রিয়াজের বাবা বললেন, "দেখা ঠিক হবে না—"

মা তখন বিচিত্র এক ধরনের হিংস্র-চোখে বাবার দিকে তাকালেন। বাবা তখন কেমন জানি ভয় পেয়ে গিয়ে তার ছোটবোনকে ডাকলেন রিয়াজকে নিয়ে আসার জন্যে। মাকে দেখে রিয়াজ পাগলের মতো হয়ে

গেল তার কাছে যাবার জন্যে, কিন্তু ফুপু তাকে শক্ত করে ধরে রাখল। বাবা চোখ দিয়ে সেইরকম নির্দেশ দিয়েছেন।

রিয়াজের মা তখন রিয়াজের কাছে এসে তার মাথায় হাত বুলালেন, তার গালে চুমু খেলেন তারপর তার দিকে তাকিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রের ডিরেক্টর ভদ্রমহিলা রিয়াজের মাকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন। বাইরে একটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা যখন চলে যাচ্ছে মা তখনো স্থিরচোখে তাকিয়ে আছেন। এরপর আর কেউ তার কোনো খোঁজ জানে না।

রিয়াজ কথা শেষ করে দীর্ঘসময় চুপ করে থাকে। ক্রিস্টিনা একটা নিশ্বাস ফেলে রিয়াজের কাছে এসে বসে তার হাত ধরে বলল, "আমি খুব দুঃখিত রিয়াজ। খুব দুঃখিত।"

রিয়াজ কোনো কথা বলল না। ক্রিস্টিনা গভীর মমতায় রিয়াজের শরীরে হাত বুলিয়ে বলল, "তুমি যেটা বলেছ সেটা একটা অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার ঘটনা।"

"কোন্ অংশটি বেশি নিষ্ঠুর ক্রিস্টিনা ? পাকিস্তান মেজরের অংশটি, নাকি আমার বাবার অংশটি ?"

"জানি না। নিষ্ঠুরতার তো ইউনিট নেই যে মাপা যায় কিংবা তুলনা করা যায়। এটি আছে কি নেই সেটাই হয়তো বলা যায়।" ক্রিস্টিনা কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তোমার মা এখন কোথায় আছেন খোঁজ নিয়েছ ?"

"চেষ্টা করেছি, লাভ হয়নি। যে কয়দিন ঢাকা ছিলাম সেটাই করেছি। প্রায় তেইশ বছর আগের ব্যাপার কেউ বলতে পারে না। ঐ সময়ে যারা এই ব্যাপারগুলোতে ছিল তাদের খুঁজে বের করে কথা বলেছি, সংস্থাগুলোর পুরনো কাগজপত্র বের করার চেষ্টা করেছি। কোথাও কিছু নেই—নরওয়ের সেই অর্গানাইজেশনটার নাম ছাড়া আমার কাছে আর কোনো তথ্য নেই। তাছাড়া আমাদের দেশের উপর দিয়ে তো ধকল কম যায়নি।"

"তোমার কাছে নরওয়ের সেই অর্গানাইজেশনের নাম আছে ?"

"হ্যাঁ। গ্রিন্ডহিউসেন।"

"গ্রিন্ডহিউসেন ? বানান করো—"

রিয়াজ বানান করল, ক্রিস্টিনা কাগজে লিখে নিয়ে তীক্ষ্ণচোখে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন বিদঘুটে নরওয়েজিয়ান শব্দটির দিকে তাকিয়ে

থেকেই সে রিয়াজের মাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। "এই নাম দিয়েই তো শুরু করা যায়। সেই সময়ে বাংলাদেশে কারা ছিল তাদেরকে যদি খুঁজে বের করা যায়।"

"সেটা কি সম্ভব ? প্রায় তেইশ বছর আগের ব্যাপার।"

"চেষ্টা করে দেখতে তো আপত্তি নেই।"

রিয়াজ উঠে দাঁড়াল,"যাই রাত হয়ে যাচ্ছে।"

"যাবে ?" বলে ক্রিস্টিনা রিয়াজের দিকে মায়াবী-চোখে তাকাল।

ক্রিস্টিনার চোখের দিকে তাকিয়ে রিয়াজ হেসে ফেলল, বলল, "তুমি যদি কিছু একটা খাওয়াতে পার তাহলে থেকে যেতে পারি।"

"সেটি আর এমন কী সমস্যা ?" বলে ক্রিস্টিনা টেলিফোন তুলে নেয়, "তোমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হচ্ছে পিতজা—তোমাকে খাওয়াতে সমস্যা কী ?"

ক্রিস্টিনা তিন রকম টপিং, প্রচুর ঝাল মশলা দিয়ে একটা পিতজা অর্ডার করে দেয়।

এক সপ্তাহ পরে রিয়াজ ক্রিস্টিনার কাছ থেকে একটা ই-মেইল পেল। ই-মেইলের নিয়মানুযায়ী সেটি সংক্ষিপ্ত এবং প্রায় সাংকেতিক ভাষায় লেখা :

> রিয়াজ, সেভেন্টি ওয়ানে বাংলাদেশে গ্রিন্ডহিউজের যোগাযোগের সূত্র খুঁজে বের করেছি। নাম লার্স ফকেনবার্গ। পুরুষ। জীবিত। বয়স তেহাত্তর। ভালোবাসা। ক্রিস্টিনা।

ই-মেইলের নিয়ম রক্ষা করে রিয়াজ সাথে সাথে ক্রিস্টিনাকে উত্তর পাঠাল :

> ক্রিস্টিনা, আমি চমৎকৃত। লার্সের টেলিফোন নম্বর ই-মেইল এ্যাড্রেস আছে ? ধন্যবাদ। ভালোবাসা। রিয়াজ।

সন্ধেবেলা ক্রিস্টিনার সাথে কথা বলে রিয়াজ বিস্তারিত জেনে নিল। লার্স ফকেনবার্গের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, সে বলেছে যে ঐ সময় বাংলাদেশ থেকে প্রায় পঞ্চাশজন মহিলাকে পৃথিবীর নানা জায়গায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। সে বছর দশেক আগে রিটায়ার করেছে বলে তার কাছে এখন কোনো তথ্য নেই। কিন্তু সে খুঁজে দেখবে।

রিয়াজ একা হলে ব্যাপারটি বেশিদূর চালাতে পারত কিনা সন্দেহ কিন্তু ক্রিস্টিনার লেগে থাকার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। নিউজার্সি বসে থেকে সে নরওয়ের নানা শহরে নানা লোকজনকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। যারা পুনর্বাসিত করেছে তাদের নাম জোগাড় করা হয়। মানুষগুলি ইউরোপ আর আমেরিকার নানা শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কোনো কোনো মানুষ তাদের আগের ঠিকানায় আছে, বেশিরভাগই ঠিকানা পাল্টেছে। অনেকদিন আগের ঘটনা তাদের অনেকে মারা গিয়েছে। কিন্তু ক্রিস্টিনা হাল ছাড়ে না। সে সারাদিন ই-মেইল পাঠায় আর সন্ধের পর থেকে টেলিফোন করতে শুরু করে। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন রিয়াজের মাকে নয় নিজের মাকে খুঁজছে!

ক্রিস্টিনার বাসায় টেবিলের উপর একটা খাম। খামটি একটি সুদৃশ্য কারুকাজ-করা বাটির মাঝে রাখা। রিয়াজ সোফায় বসে খামটির দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রিস্টিনা ফ্রিজ খুলে একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে এসে কর্কটা খুলতেই সশব্দে ফেনা বের হতে থাকে, রিয়াজ মুখে হাসি ফুটিয়ে ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আসলেই শ্যাম্পেন খুলছ ? আমি এসব সহ্য করতে পারি না। পেপসি খেলেই আমার নেশা হয়ে যায়।"

ক্রিস্টিনা হেসে বলল, "জানি। তুমি ভেবেছ আমি এত বোকা যে তোমার পিছনে আমার এত যত্নের শ্যাম্পেনের বোতল নষ্ট করব ? যে বিয়ার আর ওয়াইনের পার্থক্য জানে না ?"

"তাহলে এটা কী ?"

"এটা স্পার্কলিং সাইডার।"

"তাই বল।"

ক্রিস্টিনা সুদৃশ্য গবলেটে সাইডার ঢেলে একটা রিয়াজের দিকে এগিয়ে দেয়। নিজের গবলেট উঁচু করে বলল, "তোমার আপন মাকে খুঁজে পাওয়ার সাফল্যে—"

রিয়াজ এবং ক্রিস্টিনা গবলেট ঠোকা দিয়ে নিজেদের মুখে এনে চুমুক দেয়। রিয়াজ এক ঢোক খেয়ে বলল, "বাহ! খেতে বেশ মজা তো।"

"হ্যাঁ। তোমাদের মতো কচি খোকার জন্যে এটাই মজা। নাও এখন খামটা খোলো।"

রিয়াজ সুদৃশ্য কারুকাজ-করা বাটি থেকে খামটা তুলে নিতেই ক্রিস্টিনা হাততালি দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করল। রিয়াজ একটা নিশ্বাস ফেলে

বলল, "ক্রিস্টিনা, আমি জানি না তুমি কেন আমার জন্যে এতকিছু কর। আমি তোমার জন্যে কখনোই কিছু করতে পারিনি। আমি—"

"অনেক হয়েছে, এখন বক্তৃতা রাখ। মানুষের সম্পর্ক বিজনেস নয় যে দশ ডলার দিলে ঠিক দশ ডলার ফরত পেতে হবে। তুমি এখন খামটা খোলো।"

"ভয় করছে।"

"ভয় করছে?"

"হ্যাঁ। ঠিক জানি না কেন, কিন্তু আমার ভয় করছে।"

ক্রিস্টিনা একটু হেসে বলল, "ভয়কে জয় করতে হবে।"

খামটা ছিঁড়তেই ভেতর থেকে টুক করে কিছু একটা নিচে পড়ে গেল। রিয়াজ নিচু হয়ে তুলে নেয়, একটা ফটো। ফটোটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রিয়াজের নিশ্বাস আটকে আসে। তার মায়ের ফটো! মা কেমন যেন কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মুখে হাসি নেই, চোখে কোনো কোমলতা নেই। মাথার চুল দুই পাশে ছড়িয়ে আছে, জগৎ-সংসারের প্রতি এক বিচিত্র ক্ষোভ, এক অবিশ্বাস্য আক্রোশ।

ক্রিস্টিনা রিয়াজের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। ফটোটার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মা অত্যন্ত ফটোজেনিক। কী সুন্দর ছবি।"

"এই ছবি কখন তোলা হয়েছে?"

"গ্রিন্ডহিউসেনের ফাইলের ছবি। তেইশ বছর আগে তোলা।"

রিয়াজ খামের ভেতর থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে আনে। খামের উপর গোটা গোটা হাতে লেখা— 'নাসরিন জাহান'। নিচে একটা ঠিকানা, তার নিচে টেলিফোন নম্বর।

"ক্যালিফোর্নিয়া থাকেন?"

"হ্যাঁ। প্যাসাডিনা শহর। ফোন করতে চাও?"

"ফোন?" রিয়াজ চমকে উঠল। সে এখন ইচ্ছে করলে তার মায়ের সাথে ফোনে কথা বলতে পারবে?

"হ্যাঁ। করবে ফোন?" ক্রিস্টিনা টেলিফোনটা এগিয়ে দেয়।

রিয়াজ টেলিফোনটা হাতে নিয়ে বসে থাকে, ডায়াল করার সাহস পায় না।

"কী হল? ডায়াল কর।"

"ভয় করছে।"

"ভয় করছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে থাক। তুমি কয়দিন সময় নাও।"

"হ্যাঁ। কয়দিন সময় নিই।"

রিয়াজ অবশ্যি সময় নিল না, সে-রাতেই প্লেনের টিকেট কিনে লসএঞ্জেলেস রওনা দিল। প্যাসাডিনা শহর লসএঞ্জেলেসের উপকণ্ঠে গাড়িতে আঘঘণ্টার পথ।

॥ আট ॥

অন্ধকার হয়ে আসছে। মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রমহিলা খুব ধীরপায়ে ফুটপাত ধরে হেঁটে আসছেন। তার এক হাতে একটি ব্যাগ, এইমাত্র গ্রোসারি স্টোর থেকে বাজার করে এনেছেন। অন্য হাতে হ্যান্ডব্যাগ আলতো করে ধরা। ভদ্রমহিলার মাথার চুলে পাক ধরেছে—এই বয়সের মহিলাদের ধূসর চুল বলতে গেলে দেখা যায় না, খুব সহজেই তারা বয়সকে গোপন করতে পারেন। এই ভদ্রমহিলাটির সে-ব্যাপারে এক ধরনের ঔদাসীন্য। তার চোখে চশমা, যেটি চেহারায় খানিকটা বয়সের ছাপ এনেছে। এমন কিছু শীত পড়েনি কিন্তু ভদ্রমহিলা বেশ ভারী একটা কোট পরেছেন, শাদা একটা স্কার্ফ দিয়ে মুখ এবং গলা ঢাকা।

ভদ্রমহিলা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাথে সাথে তার থেকে কয়েক পা পিছনে রিয়াজ দাঁড়িয়ে গেল। ভদ্রমহিলা খুব ধীরে ধীরে ঘুরে রিয়াজের দিকে তাকালেন, তারপর তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, "আপনি কয়েকদিন থেকে আমার পিছনে পিছনে হাঁটছেন কেন?"

রিয়াজ হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "না মানে ইয়ে, আমি—আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই।"

"দেখুন, আমি কারো সাথে কথা বলতে চাই না।"

"আপনি—আপনি কি মিসেস নাসরিন জাহান?"

"হ্যাঁ। আমি মিসেস নাসরিন জাহান।"

"আমি—আমি রিয়াজ। আমি আপনার ছেলে।"

ভদ্রমহিলা হঠাৎ কেমন জানি একটা ধাক্কা খেলেন, কিছুক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে রিয়াজের দিকে তাকিয়ে রইলেন, হঠাৎ করে তার মুখ আশ্চর্যরকম কঠোর

হয়ে গেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, "আপনি কিছু-একটা ভুল করেছেন। আমার কোন ছেলে নেই।"

"আমি—আমি ভুল করেছি?"

"হ্যাঁ।" তিনি ঘুরে আবার সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। রিয়াজ ছুটে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল, বলল, "কিন্তু কিন্তু মিসেস নাসরিন জাহান, এই দেখেন গ্রিন্ডহিউজের কাছ থেকে আপনার ছবি—"

ভদ্রমহিলা ঘুরে রিয়াজের দিকে তাকালেন, আবার কঠিন গলায় বললেন, "আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।"

"আপনি কি বাংলাদেশ থেকে আসেননি। একাত্তর সালে—"

"না।" ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বললেন, "আপনি ভুল করছেন।"

"কেন আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না?"

"দেখুন। আপনি ভুল করছেন। আপনি আমাকে যিনি ভাবছেন আমি সেই মানুষ নই। আপনি যে-অতীতের কথা বলছেন আমার সেই অতীত নেই।"

"আছে। আপনি সেটা স্বীকার করতে চাইছেন না।"

ভদ্রমহিলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, তারপর বললেন, "একই কথা।"

রিয়াজ দাঁড়িয়ে রইল এবং দেখল তার মা তাকে এবং তার পুরো অতীতকে অস্বীকার করে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার পাশে ল্যাম্পপোস্টের হ্যালোজেন বাতি জ্বলে উঠেছে, সেই হ্যালোজেনের আলোতে তার মায়ের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

রিয়াজ প্যাসাডিনার লেক স্ট্রিটে একটা ছোট মোটেলে উঠেছে। মোটেলের দরজা বন্ধ করে বিছানায় মাথা গুজে প্রথমে সে খানিকক্ষণ কাঁদল। তারপর টেলিভিশন চালিয়ে দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। টেলিভিশনের ছকবাঁধা কৌতুক যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন সে ক্রিস্টিনাকে ফোন করল। ফোন রিং করতেই ক্রিস্টিনার গলার আওয়াজ শোনা যায়, "হ্যালো।"

"ক্রিস্টিনা, আমি রিয়াজ।"

"রিয়াজ, তুমি কোথায়?"

"প্যাসাডিনা।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। তোমার মায়ের সাথে দেখা করেছ?"

"করেছি।"

"কী হয়েছে?" ক্রিস্টিনা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, "বল। বল তাড়াতাড়ি।"

"আমার মা আমাকে স্বীকার করলেন না।"

"স্বীকার করলেন না?"

"না।"

"কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

"আমার মা পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার কররেন। কিছুতেই মানতে রাজি নন যে তার একটা অতীত আছে—আমি আছি।"

ক্রিস্টিনা শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করল।

"আমি এখন কী করব ক্রিস্টিনা?"

"আসলে—আসলে আমরা এই দিকটা চিন্তা করিনি।"

"কোন্ দিকটা?"

"এই-যে তার জীবনে যে ভয়ংকর ব্যাপারগুলি ঘটেছে, সারাটি জীবন সেটা ভুলে যাবার চেষ্টা করেছেন। এখন তুমি এসে হঠাৎ করে সেই পুরনো স্মৃতি—"

রিয়াজ প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "কিন্তু আমি তার ছেলে!"

"কিছু আসে যায় না। দেখতেই পাচ্ছ কিছু আসে যায় না।"

"আমি এখন কী করব ক্রিস্টিনা?"

ক্রিস্টিনা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে। আমি আসছি।"

রিয়াজ খুব ভোরবেলা রাস্তার পাশে একটা ম্যাকডোনাল্ডে বসে নাস্তা করল, এই পথ দিয়ে তার মা কাজে যান। রাস্তার মোড় থেকে বাসে ওঠেন। রিয়াজ গত কয়েকদিন থেকে গোপনে তার মা'কে লক্ষ করছে। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি, দৈনন্দিন রুটিন তার মুখস্থ হয়ে গেছে। বাসে উঠে যাবার পর সে তার মোটেলে ফিরে আসে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে ক্রিস্টিনাকে আনতে।

ঠিকানা দেখে নিশ্চিত হয়ে ক্রিস্টিনা দরজায় শব্দ করল। প্রায় সাথে সাথেই দরজা ফাঁক করে রিয়াজের মা নাসরিন জাহান উঁকি দিলেন, "কাকে চান?"

"আমার নাম ক্রিস্টিনা রজার্স। আপনি আমাকে চিনবেন না মিসেস জাহান। আপনার সাথে আমি একটু কথা বলতে পারি?"

"এস।" রিয়াজের মা একটু দ্বিধা করে দরজা খুলে ক্রিস্টিনাকে ভিতরে আসতে দিলেন। ঘরের ভিতরে একটি জীর্ণ সোফা এবং তার পাশে একটি ছোট টেলিভিশন, এছাড়া কোনো আসবাবপত্র নেই। ক্রিস্টিনাকে সোফায় বসতে দিয়ে বললেন, "আমি একা থাকি, আমার কাছে কেউ আসে না। তাই আমার এপার্টমেন্ট এরকম খাপছাড়া।"

"আমি জানি মিসেস জাহান।"

রিয়াজের মা হঠাৎ ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালেন, "তুমি জানো?"

"জি।"

"কেমন করে জানো?"

"আপনার ছেলে রিয়াজ আমার খুব ভালো বন্ধু।"

রিয়াজের মায়ের মুখ দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে গেল। তিনি কঠোর গলায় বললেন, "আমার কোনো ছেলে নেই। আর আমি যদি জানতাম তুমি এই পরিচয় নিয়ে আসবে, আমি তোমাকে ভেতরে আসতে দিতাম না।"

ক্রিস্টিনা সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি বললে আমি এক্ষুনি চলে যাব। কিন্তু আমি আপনার কাছে এক মুহূর্ত সময় ভিক্ষা চাইছি। মাত্র এক মুহূর্ত।"

রিয়াজের মা মুখে কাঠিন্য এতটুকু সহজ না করে কঠোর গলায় বললেন, "তুমি কী বলতে চাও মেয়ে?"

"রিয়াজ আজ সাতদিন থেকে আপনার পিছু পিছু ঘুরছে আপনাকে একনজর দেখার জন্যে, একটা কথা শোনার জন্যে।"

"তাতে কিছু আসে যায় না।"

"আমি জানি। আমি এসেছি আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"যাবার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।" ক্রিস্টিনা পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বলল, "এখানে রিয়াজের টেলিফোন নম্বর আছে, যদি আপনার কখনো ইচ্ছে হয় ওকে ফোন করতে পারেন।"

"তার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"প্লিজ। আপনি আমার হাত থেকে এটা নিন। আমি চলে গেলে ইচ্ছে করলে আপনি এটা ফেলে দিতে পারবেন। আমার সামনে ফেলবেন না, প্লিজ। আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি।"

রিয়াজের মা হাত বাড়িয়ে কার্ডটি নিলেন।

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

ক্রিস্টিনা ঘর থেকে বের হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "রিয়াজকে তার যে-মা বড় করেছে সে প্রতিরাতে আপনার জন্যে প্রার্থনা করে। তার স্বামীর আত্মার জন্যে প্রার্থনা করার আগে সে আপনার জন্যে প্রার্থনা করে।"

রিয়াজের মা দরজা ধরে দাঁড়ালেন, তার চোখেমুখে কেমন জানি ক্লান্তির ছায়া পড়ে। ক্রিস্টিনা নিচুগলায় বলল, "আমি যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতাম তাহলে আমিও আপনার জন্যে প্রার্থনা করতাম—আপনার জন্যে আর রিয়াজের জন্যে।"

"কেন?"

"আমি জানি না, মিসেস জাহান।"

রিয়াজের মা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলেন ক্রিস্টিনা নামের মেয়েটি রিয়াজ নামের ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি যেতে চাইছে না। কিন্তু মেয়েটি শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখলেন রাস্তার মোড় থেকে তারা ঘুরে তাকাল। তিনি সরে যাবেন কি না চিন্তা করলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত সরে গেলেন না।

সরে গিয়ে কী হবে? আসলে কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।

॥ নয় ॥

ঝন ঝন করে টেলিফোন বাজছে। রিয়াজ ছুটে আসছে টেলিফোন ধরতে। কত যুগ যুগ থেকে সে এইভাবে ছুটে আসছে?